বিধানচন্দ্র

মনোজিৎ বসু



পরিবেশক
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ ১ জুলাই ১৯৬০

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে অতুল্য ঘোষ কর্তৃক
১ বিধান শিশু সরণি কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

ডাঃ রায়ের বড় জীবনী-গ্রন্থ বিশেষ নেই বললেই চলে। অর্থাৎ যাকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলে। ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির ইচ্ছা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশ করার। কিন্তু ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির কাজ অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তাই ছোটদেরও উপযোগী করেই এই জীবনীটি লেখা হয়েছে। দামও আয়ত্তের মধ্যে হবে। অবশ্য এই বইয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অনেক মাল-মশলা দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ রায়ের জীবনী লেখাও একটু বিপজ্জনক। কোন অসতর্ক মুহূর্তে কোন একটি বিষয় হয়ত বাদ পড়ে যেতে পারে। আধুনিক ভারতবর্ষে ঠিক এইরকম লোক বেশী জন্মাননি। বেশী কেন, জন্মাননি বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। গোড়া থেকে শেষ অব্দি ডাঃ রায়ের জীবন খুবই উল্লেখযোগ্য। ছেলেবেলায় যেমন ছিল শরীর খারাপ, সেরকমই ছিল ভূতের ভয়। অথচ পরিণত বয়সে সেই লোক বিশেষ কখনও অসুস্থ হননি। এটা নিজের চেষ্টায়। মেধাবী ছাত্র ছিলেন না এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় একবার ফেলও করেন (যদিও তাঁর নিজের দোষে নয়)। সেই লোক টপ্ ক'রে এম. ডি. পাশ করলেন। বিলেতে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ছুটো পরীক্ষায় কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হলেন এবং একটিতে আবার প্রথম হলেন। শুনলে বেশ গল্প বলে মনে হয়। কিন্তু নিজের চেষ্টায় এটা সম্ভব করেছিলেন। কলকাতায় এসে ডাক্তারী আরম্ভ করলেন। সামান্য চাকরী। কিন্তু দেখ'তে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বোচ্চ যে পরিষদ (Indian Medical Council) তার প্রথম

বেসরকারী সভাপতি হলেন। অথচ বাল্যকালে যখন শিক্ষার্থী ছিলেন, তখন কোন বিষয়েই প্রতিভার তেমন স্ফুরণ দেখা যায়নি।

কলিকাতা কর্পোরেশনে গেলেন। তখন চিকিৎসক হিসাবে খুব পশার। সময়ের একান্ত অভাব। তবু কোথা থেকে সময় করে নিলেন এবং অক্লান্ত খেটে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এবং মেয়র। বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই। Finance কমিটিতে রগড়াতে রগড়াতে, তারপরেই ভাইসচ্যান্সেলার। যেখানেই যাচ্ছেন, সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন—কেউ বসিয়ে দিচ্ছে না। সবটাই নিজের চেষ্টায়। অদ্ভুত মনে হয়। রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। দেশবন্ধুর স্নেহভাজন হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে দাঁড়ালেন নির্দল প্রার্থীরূপে এবং তখনকার ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিধর রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে জয়ী হলেন। সেসময় দেশবন্ধুর কাছ থেকে দলীয় ছাপ নেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। উনি কিন্তু নেননি। নিজের কর্মপ্রবাহ বাংলাদেশের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন। এবং কংগ্রেসে ঢোকার পরই দেখা গেল কয়েক বছরের মধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার এবং গান্ধীজী ও পণ্ডিত মতিলালের একান্ত স্নেহভাজন ও আস্থাভাজন। রাজনীতির মধ্যে ঢুকলেন, কিন্তু অন্যান্য দিকে যেসব কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তার কোনটার সঙ্গেই সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। যখন হরিজন সেবক সঙ্ঘ সংগঠিত হল বাংলাদেশে, প্রথম সভাপতি বিধানচন্দ্র।

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের বৃহত্তম প্রদেশের রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করার জন্য আহূত হলেন। তখন রাজ্যপালের পদ ছিল মর্যাদা ও দায়িত্বে মণ্ডিত। কিন্তু বিধানচন্দ্র সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। হতে চেয়েছিলেন পশ্চিমবাংলার Development Board-এর চেয়ারম্যান। গান্ধীজীর অনুরোধে, যা ছিল তাঁর অন্তিম অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। প্রদেশ কংগ্রেসে যেসব নেতারা তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল, তাদের

মধ্যে দলাদলির আভাষ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিধানচন্দ্র বলে দিলেন যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন না। সারা জীবনই এটা দেখা গেছে যে কোন কিছু হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে তিনি বিশেষ পার্থক্য করতেন না। অথচ নির্লিপ্তও ছিলেন না। এ একটা অদ্ভুত চরিত্র।

"ভারতরত্ন" পাচ্ছেন শুনে যেমন কোন উৎসাহ দেখা যায়নি; বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ-এর সঙ্গে নৈশভোজ খেতে যেতেও সেইরকমই মনোভাব। "ভারতরত্ন" পাবার সময় একটা মজা হয়েছিল। সাধারণতঃ এইসব অনুষ্ঠানে কালো কোট পরে একটু বেশভূষা করে যাওয়াই প্রথা ছিল। ওঁর কিন্তু সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যে অদ্ভুত সার্ট-পাঞ্জাবী পরতেন, অর্থাৎ ওপর দিকটা সার্ট, নীচের দিকটা পাঞ্জাবী, দুদিকে দুটি বুক পকেট, তাই পরেই ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সামনে গিয়ে হাজির। মুখ্যমন্ত্রীরূপে তিনি ভাঙ্গা পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি করেছিলেন, সেও বিস্ময়কর। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এক জনসভায় প্রকাশ্যভাবেই বললেন, "যে কাজই করতে যাই, দেখি ডাঃ রায় শুরু করে গেছেন।" জ্যোতিবাবু বরাবরই বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। তাঁর মুখের এই স্বীকারোক্তির পর এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

এ গেল ডাঃ রায়ের একটা দিক। কাজ-কাজ-কাজ। আর একটা দিক এত সাধারণ যে লোকের অসাধারণ মনে হত। যেমন, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গাড়ী থামিয়ে বললেন, "ওহে চল, এই দোকানের কফি শুনেছি খুব ভাল।" হঠাৎ একটা দোকানে ঢুকছেন। জিজ্ঞেস করায় বললেন, "মোজা কিনতে হবে যে।" বুক পকেট থেকে ছোট একটি লাল ব্যাগ বেরোল, যেমন ছোট ছেলেমেয়েদের মনিব্যাগ থাকে। তার থেকে টাকা বেরোল। ট্রেনে বা প্লেনে যাচ্ছেন। অন্য যাত্রীরা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখল, যে ব্যাগে ক্যাবিনেট পেপার থাকে, সেই ব্যাগ থেকে দু' জোড়া তাস বেরোল এবং ডাঃ রায় সেই

তাস ডিল করছেন। আশেপাশের যাত্রীরা তো হতবাক। ডাঃ বিধানচন্দ্র সাধারণের মত সাধারণ জায়গায় তাস খেলেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আবার যখন ট্যুরে যেতেন সেখানে রাঁধুনিকে ডেকে বাতলে দিতেন মুগের ডাল হবে কি মুসুর ডাল হবে, পুঁইশাক হবে কি লাউশাক হবে, সেখানে কি মাছ বেশ ভাল পাওয়া যায়, এইসব খুঁটিনাটি নিয়েও ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আর বেশ গুছিয়ে খেতেন। অবশ্য খিচুড়ি আর পায়েস—এ দুটোই খুব প্রিয় ছিল। একদিন দেখা গেল চেয়ারের যেসব কুশন থাকে, বসে বসে তার ছেঁড়াগুলো সেলাই করছেন। যাকে ভাল খাওয়া-পরা বলে, তা খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু কোন বিপাকে পড়লে হাসিমুখে তাকে গ্রহণ করার অভ্যাস ছিল। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অভ্যেস জীবনে এসে যায়। তার ব্যতিক্রম হলে অনেক জায়গাতেই অশান্তি দেখা দেয়। একবার আজমীর থেকে সকাল আটটায় বেরোলেন, চিতোর যাবেন। প্রচলিত পথ ছেড়ে যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছন যায়, তার ব্যবস্থা করতে গিয়েই বিপত্তি হল। চিতোরে পৌঁছতেই সন্ধ্যে হল। সেই রাত্রেই ফেরা। রেলের কাষ্ঠাসনের ওপর চাদর বিছিয়ে বেশ ঘুমোলেন সারারাত। আবার পরদিন সকালে আজমীর। অর্থাৎ এক জামা-কাপড়ে, অস্নাত, অনভ্যস্ত অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। বয়স তখন ৭০-এর উর্ধ্বে। তবু আজমীরে স্নান-টান করার পর যারা দেখা করতে এল, কেউ বুঝতে পারল না যে উনি ক্লান্ত। নিজের বাড়ীতে একতলা থেকে দোতলায় ওঠবার লিফট ছিল। কিন্তু কোন রোগী, বিশেষতঃ যদি কোন দরিদ্র রোগী হয়, তাহলে তার বাড়ীতে সিঁড়ি ভেঙ্গে দু-তিন তলাতে উঠে যেতেন। পরিহাস প্রবণতাও খুব ছিল। কিন্তু যখন হাসির গল্প বা ঠাট্টা করতেন, তখন মুখের গাম্ভীর্য একটুও বদলাত না। এদিকে এত বড় হয়েছিলেন যে লোকে ঐরকম বড় লোকের পক্ষে যেসব কাজ অস্বাভাবিক বলে মনে করে, সেসব কাজেও কোন দ্বিধা ছিল না। জাপান থেকে যখন ঘুরে এলেন, সুধীর

মাধবের জন্য একটা ঘড়ি এনেছিলেন, আমি পেলুম একটা সস্তা দরের কলম, সবচেয়ে ভাল জিনিষ পেলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। একটা ডট পেন্সিল, তলায় একটুখানি রবার লাগান। কি এনেছেন সেটা তো বড় কথা নয়, সব্বাইকার কথা মনে করে যে এনেছেন, তাতেই যারা জিনিষ পেয়েছে তারা খুশী।

যেমন মুখ্যমন্ত্রীত্ব সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি চিকিৎসা সম্বন্ধেও কিছু উল্লেখ করা সমীচীন নয়। অনেকেই দেখেছেন রোগীর পাশে এক ঘণ্টা বসে রইলেন। রোগের কথাও হল না, রোগীর গায়ে হাতও দিলেন না, অথচ রোগ নির্ণয় ঠিক হয়ে গেল। আর এটা উনি এত স্বাভাবিক ভাবে করতেন, লোকে কোনদিন এতে অলৌকিকত্ব আরোপ করার সাহস পায়নি। এই লোকের জীবনী লেখা কি চাট্টিখানি কথা? যে বিষয়েই মন দিয়েছেন, তাতেই দিক্‌পাল। অথচ ডাক্তারীতে কোনদিন অবহেলা করেননি। জেলে গেলেন, সেখানেও সেই হাসপাতালেই কাজ। জেলখানায় বিভিন্ন অপরাধে যারা সাজা পেত, তাদের মধ্যে কিছু লোককে ডাঃ রায়ের মতন বন্দীদের পরিচর্যায় রাখা হত। ওঁর যারা পরিচর্যা করত, সেইসব কয়েদীরা উনি যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসেন, অঝোরে কেঁদেছিল। অর্থাৎ সব দিক দিয়ে একটা গোটা মানুষ। এরকম লোকের জীবনী লেখা খুবই শক্ত কাজ। কেউ একটু বড় হলেই তাঁকে পুজো করি, তাঁতে অলৌকিকত্ব আরোপ করি। ডাঃ রায় সে সুযোগ দিয়ে যাননি। নিজের পরিশ্রমে যে কৃতিত্ব অর্জন করা যায়, তিনি ছিলেন তার জীবন্ত উদাহরণ। এই বইয়ের মধ্যে কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে যাতে ঠিকভাবে তাঁকে বোঝা যায়।

ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি কলকাতার নারকেলডাঙ্গায় ২০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি শিশু হাসপাতাল তৈরী করেছে। শিশু হাসপাতাল তৈরী করলেও ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি মনে করে যে তাঁর

ব্যবহৃত জিনিসপত্র একজায়গায় রেখে অথবা একটি বিত্তালয় বা একটি হাসপাতাল তৈরী করলেই তাঁর প্রতি সম্যক মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা ছেলেবেলা থেকেই যাতে ডাঃ রায়ের জীবনের যা মূলমন্ত্র, কর্ম, তার সম্বন্ধে অবহিত হয়, তার জন্য ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি কাজ আরম্ভ করেছে। কলকাতার উল্টোডাঙ্গায় ৬৪ বিঘে জমি নিয়ে বিধান শিশু উত্থান তৈরী হয়েছে। শিশু উত্থান বললে জিনিসটাকে ঠিক বোঝানো যায় না। এখানে যেমন অসংখ্য দোলনা, মেরী-গো-রাউণ্ড, সী-স, স্লাইড ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম আছে, ঠিক সেইরকম এখানে চার হাজার ছেলেমেয়েকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়—বাস্কেটবল, ভলিবল, হ্যাণ্ডবল, খোখো, কাপাডি, ব্রতচারী, পি.টি., ধনুর্বিত্তা, যোগব্যায়াম, জিমন্যাস্টিক, এ্যাথলেটিক, অভিনয়, নাচ, গান, ছবি আঁকা, সাঁতার। এছাড়া একটি বড় লাইব্রেরী আছে এবং একসঙ্গে ১০০ জন বসে পড়বার মত রিডিং রুম আছে। আরও আছে একটি প্রেক্ষাগৃহ। সমস্ত শিক্ষাই অবৈতনিক এবং বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম হয়, তাদের মাসে ২৫৲ টাকা করে একবছর বৃত্তি দেওয়া হয়। আরও অনেকগুলি বৃত্তি আছে। জয়েণ্ট এণ্ট্রাস পাস করে ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করেছে, এমন ছাত্রকে মাসে ২০০৲ টাকা করে এক বছরের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থানাধিকারীকে মাসে ৭৫৲ টাকা, মাধ্যমিকে প্রথম স্থানাধিকারী ছেলে ও মেয়ে—প্রত্যেককে মাসে ৫০৲ টাকা আর একটি বৃত্তি আছে ৪০৲ টাকা মাসিক, সে-ও মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর। এছাড়া আছে প্রতিবন্ধীদের জন্য তিনটি বৃত্তি। একটি মাসিক ৭৫৲ টাকা হিসাবে এবং আর ছুটি মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে।

ডাঃ রায় ছিলেন নানা বিষয়ে আগ্রহী। সেইজন্য বিধান শিশু উত্থানে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ছেলেবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের নানা বিষয়ে আগ্রহ জন্মায়। একই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এতগুলি বিষয়ে

শিক্ষাদান ও বৃত্তি দান—অনেকের কাছেই এটা অভিনব এবং পৃথিবীতে কোথাও আজ অব্দি এভাবে চেষ্টা হয়নি। ছেলেমেয়েদের যত বিষয়ে আগ্রহ হতে পারে তার প্রায় সবগুলিরই শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তাদের আগ্রহ আরও অধিকতর হয়। ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি মনে করে এই প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁর প্রতিভার প্রতি সম্যক মর্যাদা দেওয়া হবে।

অতুল্য ঘোষ

১

ফাইনাল এম্. বি. পরীক্ষার আর দিন পনেরো বাকি। এক পরীক্ষার্থী সকাল দশটা নাগাদ মেডিকেল কলেজের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ তার চোখের সামনেই ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। চলন্ত এক ট্রামের সঙ্গে এক ঘোড়ার গাড়ির সংঘর্ষ। কী সর্বনাশ! ওই ব্রুহাম ঘোড়ার গাড়িতেই তো মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক কর্নেল পেক্ কলেজ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। আর ঠিক সেই সময় দক্ষিণ দিক থেকে এসে পড়ল সেই বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়িটি। সব স্পষ্ট দেখেছে সেই পরীক্ষার্থী।

এগিয়ে গেল সে। যাক, ভাগ্যি ভালো, দুর্ঘটনায় কেউ জখম হয়নি। কিন্তু ট্রামের জোর ধাক্কা লেগে সাহেব-অধ্যাপকের গাড়ির পিছনকার চাকা দুটি ভেঙ্গে একেবারে চুরমার। ইতিমধ্যে সেই ভাঙ্গা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন অধ্যাপক কর্নেল পেক্। সাক্ষীর আশায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। স্বভাবতই তিনি ধরে নিয়েছেন যে, এই দুর্ঘটনার জন্য ট্রামের চালকই দায়ী। ঘটনাস্থলে পরীক্ষার্থী সেই ছাত্রটির দিকে কর্নেল পেক্-এর নজর পড়ায় তিনি তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—মেডিকেল কলেজের ছাত্র তুমি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—ব্যাপারটা তো সবই নিজের চোখে দেখলে, এজন্য সাক্ষ্য দিতে পারবে?

—কেন পারবো না? অবশ্যই সাক্ষ্য দেবো।

কর্নেল পেক্ বললেন—তুমি কি মনে করো না, দুর্ঘটনার জন্য ট্রামের চালকই দায়ী?

ছাত্রটির জবাব—না। এটা আপনার গাড়ির চালকের দোষেই ঘটেছে। ট্রামকে আসতে দেখে, তার উচিত হয়নি ওভাবে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা।

সাহেব-অধ্যাপক কিছু আর না ব'লে, ছেলেটিকে ভালো ক'রে একবার দেখে নিয়ে, চলে গেলেন।

পরীক্ষার্থী সেই ছাত্রটির মুখে আদ্যোপান্ত সব শুনে, তার সতীর্থদের মধ্যে অনেকেই মন্তব্য করলে—পরীক্ষার আর মাত্র পনেরো দিন বাকি। দেখো, কর্নেল পেক্ তোমায় ঠিক ফেল করিয়ে দেবেন!

কেটে গেল এক সপ্তাহ। ফাইনাল এম্. বি. পরীক্ষার আর মাত্র আট দিন বাকি। কলেজের করিডরে আবার দেখা হয়ে গেল অধ্যাপক পেক্-এর সঙ্গে। ছাত্রটিকে ডেকে তিনি বললেন, ওহে শোনো, ট্রামওয়েজের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের জন্য আমি মামলা করছি। তুমি তো সেদিনকার সেই দুর্ঘটনার সময় গেটের সামনেই উপস্থিত ছিলে। তুমি সাক্ষ্য দেবে তো?

ছাত্রটি বললে—হ্যাঁ, দেবো।

অধ্যাপক-সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি মনে হয় না, ট্রামচালক সেদিন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ট্রাম চালাচ্ছিল?

—আজ্ঞে, না। আমি মনে করি, দোষটা আপনার গাড়ির চালকেরই। ছাত্রটি সেই সঙ্গে এ-কথাও বললে যে, সে সাক্ষ্য নিশ্চয়ই দেবে। তবে, স্বচক্ষে সে যা দেখেছে, সেই সত্য কথাই সে বলবে। কর্নেল পেক্ রেগে, মুখচোখ আরও লাল ক'রে, চলে গেলেন।

আদালতে যখন মামলা উঠলো, কর্নেল পেক্ তখন আর সেই ছেলেটিকে সাক্ষ্য দেবার জন্যে ডাকেননি। কিন্তু, সে-মামলায় তাঁর

জয় হয়নি, আদালত তাঁর ঘোড়ার গাড়ির চালককেই দোষী সাব্যস্ত করেন। মেডিকেল কলেজের যে-সহপাঠীরা সেই ছেলেটিকে বলেছিল —'দেখো, কর্নেল পেক্ ঠিক তোমায় ফেল করিয়ে দেবেন'—তাদের কথাই শেষপর্যন্ত ফলে গেল। ট্রামের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ির সেই দুর্ঘটনার পনেরো দিন বাদে যখন ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হ'লো, তখন ধাত্রীবিদ্যার মৌখিক পরীক্ষা নিতে গিয়ে কর্নেল পেক্ সেই ছাত্রটির মার্কশীটে তার নামের পাশে বেশ বড়ো ক'রে একটা শূন্য বসিয়ে দিলেন। অথচ, ছাত্রটিকে কোনো কিছু বলবারই তিনি কোনো সুযোগ দেননি। সে-বেচারী পরীক্ষা দিতে ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্নেল পেক্ তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—এবং পর-মুহূর্তেই মার্কশীটে ওই কাণ্ড ক'রে বসেন। অথচ, ছাত্রটি আর সব বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাস মার্ক পেয়েছিল, কেবল কর্নেল পেক্-ই নিছক রাগের বশে ধাত্রীবিদ্যার সেই মৌখিক পরীক্ষায় তাকে ফেল করিয়ে দিলেন।

অনেক কষ্ট ক'রে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, এতদিন ডাক্তারি পড়েছে ছেলেটি। এই অঘটন ঘটে যাওয়ায় তার অবস্থা হ'লো একান্ত অসহায়ের মতো। ব্যর্থতার গ্লানি তার মনের ওপর চেপে বসলো। মেডিকেল কলেজের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট তখন কর্নেল ল্যুকিস। সব ছাত্রকেই তিনি স্নেহ করতেন—বিশেষ ক'রে এই ছাত্রটিকে। তিনি ছেলেটির ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে, কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করায়, তার মুখ থেকে সবই জানতে পারলেন। কর্নেল ল্যুকিস তখন ছাত্রটিকে সান্ত্বনা দিয়ে, উৎসাহিত করবার ভঙ্গিতে বললেন—'দেখ, উদ্যম হারিয়ো না, সাহস হারিয়ো না। পনেরো দিন বাদেই এল্. এম্. এস্. পরীক্ষা। তুমি সেই পরীক্ষায় ব'সো। তারপর দু'বছর বাদে একেবারে এম্. ডি. পরীক্ষা দিয়ো।' সে-কথা শুনে উৎসাহিত হ'লেও, ছেলেটি আমতা-আমতা ক'রে বললে—'কিন্তু স্যর, সেখানেও তো কর্নেল পেক্ পরীক্ষক!' কর্নেল ল্যুকিস তখন জবাব দিলেন—'তাই ব'লে তুমি

হতোত্তম হয়ে ব'সে থাকবে ? সেটা উচিত হবে না।'

ছেলেটি এল্. এম্. এস্. পরীক্ষা দিল। সেখানেও কর্নেল পেক্ ছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি আর গোলমাল করলেন না। সম্ভবত ইতিমধ্যেই তাঁর মনে অনুশোচনা হয়েছিল। এবারে তাঁর কাছে পরীক্ষায় ছাত্রটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'লো। এর দু'বছর বাদে সে হ'লো এম্. ডি.; অর্থাৎ, কলকাতা মেডিকেল কলেজের সর্বোচ্চ ডিগ্রি সে লাভ করলো।

সে-যুগে ইংরেজদের মধ্যে কর্নেল পেক্-এর মতো শত্রুতাভাবাপন্ন লোক যেমন ছিল, তেমনি আবার ছিল কর্নেল ল্যুকিসের মতো দয়ালু ও মমতাপ্রবণ মানুষ। সেজন্য এই ছাত্রটির জীবনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো বিদ্বেষ দেখা যায়নি—যদিও স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য আরও অনেকের মতো তাকেও ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়েছিল, এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবে তাকেও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল।

এই ছাত্রটিই উত্তরকালের স্বনামধন্য ডাক্তার বি. সি. রায়, ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তো বটেই—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

বিহারের পাটনা শহরের বাঁকিপুর অঞ্চলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই বিধানচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ছিল বাংলার যশোহর জেলায়, শ্রীপুর গ্রামে। পাটনা এখন বিহারের রাজধানী-শহর হ'লেও, সে-সময় পাটনা-সমেত সমগ্র বিহার ছিল বাংলা-প্রদেশের অন্তর্গত। বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন সেকালের ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট এক নেতা ও সমাজসেবী। পেশার দিক থেকে তিনি প্রথমে ছিলেন পাটনার এক আবগারী দারোগা (এক্সাইজ্ ইন্সপেক্টর)। বিধানচন্দ্রের জন্মের তিন বছর

পরে নিজের কর্মদক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণে তিনি 'ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট'-পদে উন্নীত হন। সে-সময় তাঁর কর্মস্থল হয় মতিহারী। কর্মনিষ্ঠা, সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য প্রকাশচন্দ্রের খুবই সুনাম হয়েছিল।

বিধানচন্দ্রের মা অঘোরকামিনীও ছিলেন সেকালের এক আদর্শ মহিলা। স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। স্বামীর মতো তিনিও ছিলেন ঈশ্বরবিশ্বাসী, ধর্মপরায়ণ, পরদুঃখকাতর, দীন-দরিদ্রের সহায়। বিধান-চন্দ্রের ওপর তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল খুব বেশি।

পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বিধানচন্দ্র ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সকলের বড়ো দুই দিদি—সুসর্বাশিনী ও সরোজিনী। তাঁদের পরে তিন ভাই—সুবোধচন্দ্র, সাধনচন্দ্র আর বিধানচন্দ্র। জনশ্রুতি এই যে, বিধান-চন্দ্রের 'বিধান' নামটি রেখেছিলেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের পুরোধা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

ছেলেবেলায় বিধানচন্দ্রের পিতামহী কিন্তু আদর ক'রে তাঁর একটি ডাকনাম রেখেছিলেন। সে-নাম হ'লো—'ভজন'। লোকজনের কাছে বৃদ্ধা ঠাকুমা স্নেহমাখা কণ্ঠে বলতেন, 'এই যে দেখছ আমার ছোটো দুই নাতি—'সাধন' আর 'ভজন', এরাই আমার সাধন-ভজন!'

এই 'সাধন-ভজন' নাম নিয়ে শৈশবে বিধানচন্দ্র একবার এক মজার কাণ্ড ক'রে বসেছিলেন। 'সাধন' কথার অর্থ যে 'আত্মসংযম', আর 'ভজন' বলতে যে 'ঈশ্বরের নামগান করা' বোঝায় শিশু-বিধান তা জানতেন না। তিনি জানতেন 'সাধন' মানে 'ছোড়দা' আর 'ভজন' তো তিনি নিজেই। বাড়িতে একদিন সমবেত-উপাসনার সময় শিশু-বিধান স্পষ্ট শুনতে পেলেন তাঁর পিতৃদেব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে গিয়ে বললেন—'হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো। আমার না-আছে সাধন, না-আছে ভজন।' অর্থাৎ, প্রকাশচন্দ্র বলতে চেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে যেমন আত্মসংযম নেই, তেমনি ঈশ্বরের নামগানও তিনি যথাযথ করতে পারেন না। এই

ত্রুটির জন্য ঈশ্বর যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। কিন্তু শিশু-বিধানচন্দ্র সে-তত্ত্বকথা বুঝবেন কেন? উপাসনার পর তিনি সোজাসুজি বাবাকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'সাধন-ভজন আমরা দু'ভাই থাকতেও আপনি কেন আজ উপাসনার সময় বললেন, আপনার না-আছে সাধন, না-আছে ভজন?' শিশুপুত্রের মুখে সে-কথা শুনে প্রকাশচন্দ্র তো তখন আর হেসে বাঁচেন না! ছেলেকে কাছে বসিয়ে, তিনি তখন সাধন-ভজন কথা দুটির গূঢ়ার্থ বুঝিয়ে দিলেন।

পরবর্তী কালে, আমরা যাঁর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ দেহ দেখে ঈর্ষিত হয়েছি—তিনি কিন্তু আজন্ম তেমন ছিলেন না। শৈশবে বিধানচন্দ্রের চেহারা ছিল রোগাটে ও দুর্বল ধরনের। তার ওপরে তিনি ছিলেন একটু ভীতু স্বভাবের। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে তাঁর গা যেন কেমন ছমছম ক'রে উঠতো। ঘরের বাইরে একলা যেতে ভয় পেতেন। মনে হ'তো সেই অন্ধকারে গাছের ডালে, নয়তো ঝোপে-ঝাড়ে ভূতেরা সব লুকিয়ে আছে; সেই অন্ধকারে পা বাড়ালেই তারা এসে ঘাড় মট্‌কে দেবে! সম্ভবত ভূতের গল্প শুনে-শুনে ছেলেবেলায় তাঁর মনের কোণে ওই রকমের একটা ভয়ের ভাব বাসা বেঁধেছিল। বলা বাহুল্য, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সে-ভাবটা কেটে যায়।

বালক বিধানচন্দ্রের লেখাপড়ার সূত্রপাত হয়েছিল এক গ্রাম্য পাঠশালায়। পরে তাঁকে ভরতি ক'রে দেওয়া হয় 'টি. কে. ঘোষ ইন্সটিটিউশন'-এর নিচের দিককার কোনো ক্লাসে। এই স্কুলে কিছুকাল পড়বার পর, তাঁকে ভরতি ক'রে দেওয়া হয় 'পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে'। ছাত্র হিসাবে তিনি আদৌ অসাধারণ ছিলেন না। আর পাঁচটি সাধারণ ভালো ছেলের মতোই নিয়মিত স্কুলে যেতেন, নিয়ম মেনে পড়াশোনা ও খেলাধুলা করতেন।

আত্মনির্ভর হয়ে ওঠবার চমৎকার একটা শিক্ষা পেয়েছিলেন বিধানচন্দ্র, তাঁর সেই ছেলেবেলায়। স্কুলে যেদিন ছুটি থাকত, বালক বিধান সেদিন দাদাদের সঙ্গে বাড়ির কাজকর্মে মেতে উঠতেন। ঘরদোর

ঝাঁট দিতেন, আসবাবপত্র ঝেড়েপুঁছে পরিষ্কার করতেন, পোষা ঘোড়াদের ঘাস-চানা খাওয়াতেন। শুধু কি তাই? মাঝে-মাঝে বাসনকোসন মাজতেন, বালতি ভ'রে ইঁদারা থেকে জল তুলতেন। কোনো-কোনো ছুটির দিন আবার দাদাদের সঙ্গে একটা-দুটো রান্নাও করতেন। আত্মনির্ভর ও সদা-পরিচ্ছন্ন গান্ধীজী যেমন নিজের হাতে তাঁর স্নানাগার ও শৌচাগার পরিষ্কার করতেন, প্রকাশচন্দ্রও তেমনি তাঁর ছেলেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আত্মনির্ভর ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে বাড়ির স্নানাগার ও শৌচাগার কী ক'রে সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হয় তা তাঁদের ভালো ক'রেই শিখিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে এই ভাবে নিজের হাতে কাজকর্ম শিখতে পেরে, বিধানচন্দ্রের মনে একটা আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল। এই আত্মবিশ্বাসই ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের মূলে।

সে-যুগের একজন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে হ'লেও, বিধানচন্দ্রের বাল্যকাল কেটেছে নিতান্ত সাধারণভাবে। বিলাসিতার কোনো নামগন্ধ ছিল না। পিতৃদেবের আয় যদিও মোটামুটি ভালোই ছিল, কিন্তু তিনি আদৌ ধনী ছিলেন না। কারণ, তাঁর পোষ্য ছিল অনেক, আর তাঁর দান-খয়রাতও ছিল প্রচুর। বালক বিধানচন্দ্র লক্ষ্য করতেন, বাড়িতে শুধু-যে তাঁরা পাঁচ ভাইবোন তা নয়, তাঁদের পরিবারে আরও কয়েকটি অনাত্মীয় ছেলে প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে কয়েক-জন আবার অনাথ বালক। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদেরও সমান স্নেহে ও যত্নে মানুষ ক'রে তুলছেন। সুবোধ-সাধন-বিধানের জন্য যে-রকমের আহার্য বরাদ্দ, তাদের জন্যও ঠিক সেই রকম। সুবোধ-সাধন-বিধান যে-ধরনের জামা-কাপড় পরতেন, সেই পোষ্য বালকেরাও ঠিক সেই ধরনের জামা-কাপড় পেতো পরবার জন্য। এইভাবে একসঙ্গে মানুষ হয়ে ওঠার জন্য, বিধান ও তাঁর দাদারা কেউই বাড়ির সেই অনাত্মীয় ছেলেদের থেকে নিজেদের পৃথক ক'রে ভাবতে শেখেননি। অন্যদিকে

সেই ছেলেরাও রায়বাড়ির ছেলেদের নিজেদের আপনজন ব'লেই জানতো।

শৈশবে এইভাবে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভেদাভেদ ভুলে, সকলের সঙ্গে একইভাবে বড়ো হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ব'লে, বিধানচন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই মানবদরদী হয়ে উঠেছিলেন।

তাছাড়া অপরের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারলে যে অপরিসীম একটা মানসিক আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা যায়, সে-শিক্ষাও বিধানচন্দ্র পেয়েছিলেন তাঁর শৈশবে, মা-বাবার মানবসেবার দৃষ্টান্ত থেকে। এই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে, পরবর্তী জীবনে বিধানচন্দ্র নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—'একদিন রাত দুটো নাগাদ কে-একজন বাড়িতে এসে মাকে ডাকলো। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে, গরিব এক গৃহস্থের বাড়িতে মাকে সে নিয়ে যেতে এসেছে। সে-বাড়ির বৌটি আসন্ন-সন্তানপ্রসবা। মা তো সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলেন। মা'র সঙ্গে বাড়ির একজন কাজের লোকও গেল একটা লণ্ঠন, একটা ঝাঁটা, কিছু জামা-কাপড়, আর কিছু জীবাণুনাশক ওষুধপত্র নিয়ে। অত রাত্রে মাকে ওইভাবে পরের সেবাশুশ্রূষার কাজে যেতে দেখে, এবং পরদিন সকালবেলায় তাঁর মুখে-চোখে পরসেবায় আনন্দ-লাভের যে পরিতৃপ্তির ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা লক্ষ্য ক'রে, সেই বালকবয়সে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।' বালক বিধান যখন পরদিন বাড়ির সেই কাজের লোকটির কাছে জানতে পারেন যে, তাঁর মা অঘোরকামিনী সেই গরিব স্ত্রীলোকটির সন্তান-প্রসবের সময় সব রকমে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেছেন, নিজের হাতে ঝাঁটা দিয়ে তাঁর ঘরদোর সাফ ক'রে, তাঁকে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে, নব-জাতককে কী ভাবে দেখাশোনা করতে হবে সে-বিষয়ে নির্দেশাদি দিয়ে, চার ঘণ্টা বাদে বাড়ি ফিরেছেন—তখনই উপলব্ধি করতে পারেন যে, মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে যদি-না সত্যিকারের কোনো আনন্দ পাওয়া যেতো, তবে কি আর তাঁর মা অত রাত্রে অমন

ক'রে পরের বাড়িতে ছুটে যেতেন ?

স্কুলের ছাত্র হিসাবে বিধানচন্দ্র যে অসাধারণ প্রতিভা বা বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন না, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। যাকে বলে সাধারণ মেধার ছাত্র, তিনি ছিলেন তাই। তবে, শৈশবে তিনি ছিলেন বিশেষ কৌতূহলী এবং তাঁর অনুসন্ধিৎসাও ছিল প্রবল। গণিতের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গণিতের পরীক্ষায় বরাবরই তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত করেছেন। তাই বলে শুধুই পড়াশুনো নিয়ে থাকতেন তাও না। শৈশবে দৌড়ঝাঁপ ও ফুটবল খেলাই ছিল তাঁর কাছে প্রিয়। ফুটবল খেলা যে তাঁকে কি পরিমাণ আকর্ষণ করতো, সে-সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে। তবে, নিছক গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। সে-বার তিনি প্রবেশিকা (এনট্রান্স) পরীক্ষা দিচ্ছেন। একেবারে শেষদিনে ছিল ড্রইং-এর পরীক্ষা। স্কুলের পরীক্ষা-কক্ষে ব'সে দিব্যি তিনি একমনে ড্রইং করছিলেন ; হঠাৎ কানে এলো স্কুলের খেলার মাঠে কে যেন ফুটবলে খুব জোরে একটা কিক্ মারলো। ব্যস্, আর কি পরীক্ষা দিতে মন বসে ! অর্ধসমাপ্ত সেই ড্রইং-সমেত পরীক্ষার খাতাটা জমা দিয়ে, তিনি তখন সোজা চ'লে গেলেন খেলার মাঠে, বল খেলতে। সে যাই হোক, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি শেষপর্যন্ত মোটামুটি ভালোভাবেই পাস করেছিলেন। এর একবছর আগে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়—তৎসত্ত্বেও।

তারপর এফ্-এ (ফার্স্ট আর্টস্) পরীক্ষা। দু'বছর পাটনা কলেজে প'ড়ে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তার দু'বছর বাদে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, সেই কলেজ থেকেই গণিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করলেন।

এবারে নিজের জীবন গ'ড়ে তোলার পালা। এবারে কী করবেন ?

তিনি যখন কলেজের ছাত্র, তখন তাঁর বাবা একদিন তাঁকে

বলেছিলেন যে, তিনি যতদিন না আঠারো বছর বয়স পার হচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর বাবাই তাঁকে পরিচালিত করবেন। কিন্তু তার পর থেকে বিধানকে নিজের সব দায়িত্ব নিজেকেই পালন করতে হবে। এবারে তো সেই দায়িত্ব এসে পড়লো। কেননা, বিধানচন্দ্র তখন আঠারো বছর এক মাস বয়সের যুবক!

এই প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণ: "জীবনে আমার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমার জীবনের একমাত্র আদর্শ—যখন যে-কাজ হাতে আসবে, তখন তা সর্বশক্তি দিয়েই করবো।...বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "এবারে আমি কী করতে চাই।" স্যর জন উডবার্ন ছিলেন তখনকার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর। ব্রাহ্মসমাজের সর্বজন-পরিচিত নেতা শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্ব। স্যর জন তাঁকে বলেছিলেন যে, শ্রদ্ধেয় মজুমদারের সুপারিশ থাকলে, ব্রাহ্মসমাজের তিনটি বুদ্ধিদীপ্ত যুবককে তিনি ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেবেন। সেই তিনটি পদের একটি আমাকে দিতে চাওয়া হ'লো। সে-কথা শুনে বাবা বললেন যে, তিনি ত্রিশ বছর সরকারী চাকরি করেছেন, তিনি চান না যে, ছেলেরা, প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধস্তন তিন পুরুষের কেউ, সরকারের অধীনে চাকরি করুক। তারপর তিনি আমার ঝোঁকটা কোন্‌দিকে তা জানতে চাইলেন। তার জবাবে বাবাকে আমি বললাম, বিশেষ কোনো একটা দিকে আমার কোনো ঝোঁক নেই।"

এর পরে কী হ'লো? বিধানচন্দ্রের নিজের কথায়: "আমি শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আর কলকাতা মেডিকেল কলেজ দু' জায়গাতেই ভরতি হবার জন্য দরখাস্ত পাঠালাম। তারপর যা ঘটলো, সেটা নেহাতই একটা আকস্মিক ব্যাপার। একই দিনে দু' জায়গা থেকে দরখাস্তের জবাব এলো। সকাল দশটায় মেডিকেল কলেজের চিঠি পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনি-অর্ডার ক'রে ভরতি হবার ফী পাঠিয়ে দিলাম সেই কলেজের ঠিকানায়। ভরতিও হয়ে গেলাম

সেখানে। ওদিকে সেইদিন বিকেলেই এলো শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের চিঠি। দরিদ্র সন্তান হিসাবে আমি যদি শিবপুরে ভর্তি হতাম, তাহ'লে আর্থিক দিক থেকে সুবিধে হ'তো। কেননা, সেখানে স্কলারশিপটা পেতাম, পড়াশোনার খরচটা তাতেই চ'লে যেতো। কিন্তু আমার মধ্যে পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না, জীবনের পথে যা এসে গেল তা-ই গ্রহণ করলাম। মেডিকেল কলেজে ইতিমধ্যেই ভরতি হবার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি, কাজেই সেইখানেই পড়বো ব'লে মনস্থির ক'রে ফেললাম।"

২

১৯০১ সালের জুন মাস।

কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়বার জন্য বিধানচন্দ্র পাটনা থেকে সোজা চ'লে এলেন রাজধানী-শহরে। কলকাতা তখন ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের রাজধানী।

এতদিন তাঁর জীবন কেটেছে পাটনার শহরতলী বাঁকিপুরে, মাঝে কিছুকাল গয়া আর মতিহারীতে। বিরাট শহর কলকাতার হালচাল বিশেষ কিছুই তাঁর জানা ছিল না। তাই, গোড়ার দিকে কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সে যাই হোক, থাকবার একটা ব্যবস্থা ক'রে নিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের লাগোয়া ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলে।

হোস্টেলের যে-কক্ষে তিনি থাকতেন, সেই কক্ষে মেডিকেল কলেজের আরও একটি ছাত্র থাকতো। হোস্টেল-বাসের প্রথম রাত্রেই সেই রুমমেটের আচরণে বিধানচন্দ্র তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন। একেই বিধানচন্দ্রের স্বাস্থ্য ছিল কিছুটা কমজোরী, তার ওপর ছিল সর্দির ধাত। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এবং বৃষ্টির সময় জ'লো হাওয়া গায়ে লাগলে তাঁর অস্বস্তিবোধ হ'তো। ফলে, সর্দিতে বা সর্দিজ্বরে প্রায়ই ভুগতেন। সেদিন শুতে গিয়ে দেখেন ঘরের দক্ষিণ দিকে যে একটি মাত্র জানালা, তা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকছে হু হু ক'রে। বেশ শীত শীত করছে। সর্বনাশ, এভাবে যদি সারা রাত জানালা খোলা থাকে, তাহ'লে সর্দিজ্বর নির্ঘাত! রুমমেট, মেডিকেল

কলেজের উঁচু-ক্লাসের সেই ছাত্রটিকে তিনি তখন বললেন, 'জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলে ভালো হ'তো, নইলে এই জ'লো হাওয়ায় আমার ঠিক সর্দি লাগবে, জ্বর হবে।' বিধানচন্দ্রের সে-কথা শুনে, সেই ছাত্রটি রীতিমতো আপত্তি করলে। কেননা, সেই ঘরে একটি মাত্র দরজা, আর জানালাও মাত্র একটি। দরজা তো বন্ধই রাখতে হবে। এখন যদি জানালাও বন্ধ রাখতে হয়, তাহ'লে ঘুম হবে কী ক'রে! ঘর গুমোট হয়ে উঠবে, তাতে তার শরীরই খারাপ হবে। না, তা হয় না। বিধান আর কী করেন, সিনিয়র রুমমেটের ইচ্ছাই মেনে নিতে হয় তাঁকে। জানালাটা সারা রাতই খোলা থাকে। পরদিন সকালে উঠেই বিধান টের পেলেন তাঁর গা বেশ গরম, জ্বর হয়েছে। তা সত্ত্বেও, পরদিনও সেই রুমমেট ছাত্রটি জানালা খোলা রাখলো। এইভাবেই চললো দিন কয়েক। বিধান কখনো সর্দিতে ভোগেন, কখনো সর্দিজ্বরে। কিন্তু এইভাবে থাকতে থাকতে, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ও জ'লো হাওয়া সম্পর্কে বিধানচন্দ্রের স্পর্শকাতরতা একদম সেরে গেল। সেই ঘটনার উল্লেখ ক'রে, পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, মানুষ যদি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সে যদি-না মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতর হয়, তাহ'লে শরীর ও মনের দিক থেকে সে অনেক অক্ষমতাই জয় করতে পারে।

প্রথম যেদিন বিধানচন্দ্র মেডিকেল কলেজে ক্লাসে যোগ দিতে যান, সেদিন সেখানকার 'ডিসেক্‌শন হলে' গিয়ে দেখেন এক দেওয়ালে ছোট্ট একটা বোর্ডে গোটা গোটা ক'রে লেখা আছে—'Whatever thy hands findeth to do, do it with thy might'—অর্থাৎ, 'তোমার হাতে যখনই যে-কাজ আসবে, তা তোমার সর্বশক্তি দিয়ে করবে।' সেই বাণীটি যেন সেই মুহূর্তেই তাঁর মনের মণিকোঠায় চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে রইলো। বিশেষ একটা অনুপ্রেরণা তিনি পেলেন সেই বাণী থেকে। মনপ্রাণ ঢেলে সেদিন থেকেই বিধান

তাঁর পড়াশোনা করতে লাগলেন।

তবে, এই যে পড়াশোনা, তা কি তিনি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে ও নিশ্চিন্ত মনে ক'রে যেতে পেরেছেন? না, তা তো নয়। মেডিকেল কলেজে পড়বার প্রথম বছর বাবার কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য পেলেও, দ্বিতীয় বছর থেকে সে-টাকার পরিমাণ খুবই কমে যায়। কেননা, প্রকাশচন্দ্র ইতিমধ্যে সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং যে-পেনশন পাচ্ছেন তা থেকে বিধানকে আর বেশি টাকা পাঠানো তাঁর পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, বিধানের দুই দাদা সেই সময় বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করছিলেন ব'লে, তাঁদের দু'জনকেও নিয়মিত টাকা পাঠাতে হ'তো।

যাই হোক, বিধানচন্দ্র দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ওঠবার পর কিছুটা যেন সুরাহা হ'লো। কলেজ থেকে মাসিক দশটাকার একটা বৃত্তি পেলেন তিনি। কিন্তু, সেই সামান্য দশটাকায় তো আর হোস্টেলে থাকা-খাওয়া, কলেজের 'ফী' দেওয়া, বই ও খাতাপত্র কেনা এবং অন্যান্য খরচ মেটানো সম্ভব নয়। উদ্যোগীপুরুষ ছাত্র বিধানচন্দ্র তাই শীতকালে দৈনিক প্রায় বারো ঘণ্টা পুরুষ-নার্সের যাবতীয় কাজ ক'রে, আট টাকা ক'রে রোজগার করতে লাগলেন। এইভাবে শীতের মরশুমে দু'জন সহৃদয় বড়ো ডাক্তারের সহায়ক হিসেবে কাজ ক'রে তিনি প্রায় দু'শ টাকা উপার্জন করেন। তাতেই তিনি হোস্টেলে থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার খরচ মোটামুটিভাবে চালিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু, যে-পাঁচ বছর তাঁকে মেডিকেল কলেজে পড়তে হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচ-টাকা দামের একখানা বই কেনা ছাড়া, চিকিৎসাবিদ্যার আর কোনো বই-ই তাঁর পক্ষে কেনা সম্ভব হয়নি। সহপাঠীদের কাছ থেকে বই ধার ক'রে এনে পড়েছেন এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, পাতার পর পাতা লিখে নিয়েছেন। তাছাড়া, কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়েও পড়েছেন। পড়াশোনার জন্য তাঁর এই যে অধ্যবসায় ও একাগ্রতা, তাই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল সাফল্যের পথে।

সাফল্যের সেই পথ অবশ্য নিষ্কণ্টক ছিল না। এম-বি পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে তৈরী হয়েও, এমন কি লিখিত পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েও, জনৈক ইংরেজ অধ্যাপকের কুনজরে পড়ায়, বিধানচন্দ্র সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারেন নি। কেন পারেন নি, সে-কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

যাই হোক, ১৯০৬ সালে চব্বিশ বছরের তরুণ বিধানচন্দ্র এল্. এম্. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসা-বিদ্যায় স্নাতক হ'লেন। তার পরেই যোগ দিলেন প্রাদেশিক মেডিকেল সার্ভিসে, একজন সহকারী-সার্জন হিসেবে। হাউস-ফিজিশিয়ানরূপে তাঁর চাকরি হ'লো তাঁর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তথা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল ল্যুকিসের অধীনে। কর্নেল ল্যুকিস প্রায়ই তাঁকে মেডিকেল কলেজের নীচু ক্লাসের ছাত্রদের পড়াবার নির্দেশ দিতেন। বিধান তখন একাধারে চিকিৎসক ও শিক্ষকের কাজ করতে লাগলেন। ক্লিনিক্যাল ক্লাসের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে গিয়ে, ক'দিনের মধ্যেই তিনি তাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। সেই গুণগ্রাহী ছাত্রদের মাধ্যমে একজন উঠ্তি ডাক্তার হিসেবেও তাঁর ডাক আসতে লাগলো রোগীদের বাড়ি থেকে। তাছাড়া কর্নেল ল্যুকিস তো প্রকাশ্যেই সকলের কাছে তাঁর তরুণ ছাত্র ডক্টর বি. সি. রায়-এর গুণকীর্তন করতেন!

হাসপাতালে সহকারী-সার্জনরূপে বিধানচন্দ্র যেমন কঠোর পরিশ্রম ক'রে রোগীদের দেখাশোনা ও চিকিৎসা করতেন, তেমনি করতেন গৃহস্থবাড়ির রোগীদের ক্ষেত্রেও। কোনো বাড়িতে গিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করবার পর নিছক একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়েই তিনি চ'লে আসতেন না; বহুক্ষেত্রেই তিনি নিজের হাতে রোগীকে ওষুধ খাওয়াতেন, স্পঞ্জ করাতেন, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে রোগীর পথ্য পর্যন্ত রেঁধে দিয়ে আসতেন। সে-যুগে এখনকার মতো নার্সিং-এর ব্যবস্থা ছিল না ব'লে, বিধানচন্দ্র বহু ক্ষেত্রেই তাঁর রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করেছেন নিজের হাতে। সেবা-র এই মহৎ ব্রতে তাঁকে

বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু কর্নেল ল্যুকিস। রোগীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল একজন সুচিকিৎসক হিসাবে বিধানচন্দ্রের সুনাম হয়েছিল ডাক্তারি-পেশার সেই হাতেখড়ি-পর্বেই।

বিধানচন্দ্রের জীবনে কর্নেল ল্যুকিসের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি যে সেই ভারত-হিতৈষী ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ শিক্ষক-ডাক্তারের কাছ থেকে শুধু সেবাব্রতের অনুপ্রেরণাই পেয়েছিলেন তা নয়, জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণাও পেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে দু-একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিধানচন্দ্র ছিলেন পি. এম. এস্.—অর্থাৎ, প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসের ডাক্তার। আর, সরকার-নিযুক্ত অধিকাংশ ইংরেজ ডাক্তারই ছিলেন আই. এম্. এস্.—অর্থাৎ, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের। সেই আই. এম্. এস্. শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ চিকিৎসকদের অনেকেই পি. এম্. এস্. কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তারবাবুদের নেকনজরে দেখতেন না। বরং একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করতেন। সহকারী-সার্জেন হিসেবে মেডিকেল কলেজে কাজ করবার সময়, ডাক্তার রায় একদিন সকালবেলা ইউরোপীয়ান ফিমেল ওয়ার্ডে গিয়ে দেখেন যে, আগের দিন তিনি এক রোগিণীর বেডটিকেটে যে-নির্দেশ লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, রেসিডেণ্ট-সার্জেন ক্যাপ্টেন আরউইন এসে, জনৈকা নার্সের কথায়, তা কেটে অন্যরূপ নির্দেশ লিখে নামসই ক'রে গেছেন। জাতীয় মর্যদোবোধে ঘা লাগলো বিধানচন্দ্রের। তাঁর কর্তব্য-সম্পাদনে ক্যাপ্টেন আরউইনের সেই নিয়মবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত হস্তক্ষেপ তাঁর কাছে অসহ্যবোধ হ'লো। তিনি সেই বেডটিকেট হাতে নিয়ে সোজা চ'লে গেলেন কর্নেল ল্যুকিসের কাছে। বেডটিকেটের সেই কাটাকুটি দেখিয়ে, রোগিণীর অবস্থা ও তিনি কী নির্দেশ লিখেছিলেন, সবই বুঝিয়ে বললেন তাঁকে। কর্নেলের বুঝতে অসুবিধা হ'লো না, ডাক্তার রায় মনে মনে কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছেন ক্যাপ্টেন আরউইনের সেই অসঙ্গত অশোভন আচরণে।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডেকে পাঠালেন রেসিডেন্ট-সার্জেন আরউইনকে। তিনি আসা মাত্রই কর্নেল ল্যুকিস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আরউইন, আমার হাউস-ফিজিশিয়ানের নির্দেশ কাটার মানে কি? তারপর আরউইনের হাত ধ'রে তাঁকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে, কর্নেল আরও অনেক কথাই বললেন। সে-সব কথা বিধানচন্দ্রের কানে না এলেও, আরউইনের মুখচোখের ভাব দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, আরউইন সাহেব তিরস্কৃত হয়েছেন। কর্নেল ল্যুকিস নিজের অফিস-ঘরে ফিরে এসে ডাক্তার রায়কে বললেন, যাও, তোমার ওয়ার্ড-ইন্সপেকশনের কাজে যাও। তোমার কাজে আর কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না।

এই ধরনের আরও একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বিধানচন্দ্রের অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের বর্ণনায়। সেই বর্ণনায় আছে যে, বিধানচন্দ্র যখন কর্নেল ল্যুকিসের অধীনে মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালের হাউস-ফিজিশিয়ান, তখন তিনি ইউরোপীয় পোশাক প'রে হাসপাতালের কাজে যেতেন। সেই পোশাক পরা থাকলে, পূর্বাহ্ণে ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে দেখা হ'লে, হাত তুলে 'সেলাম' জানাতে হ'তো না; মুখে শুধু 'গুড্ মর্নিং' বললেই চলতো। তরুণ ডাক্তার বিধানচন্দ্র তাই-ই করতেন। একদিন সকালে হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে দেখা হয়ে গেল সিনিয়র ফিজিশিয়ান কর্নেল বার্ডের সঙ্গে। ডাক্তার রায় তাঁকে 'গুড্ মর্নিং' ব'লেই নিয়মমাফিক শিষ্টতা প্রকাশ করলেন। কর্নেল বার্ড তাতে পাল্টা কোনো সাড়া না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হাত তুলে 'সেলাম' করলেন না কেন? ডাক্তার বিধান সে-কথার জবাবে বললেন—ইউরোপীয় পোশাক পরা থাকলে তো হাত তুলে 'সেলাম' জানাবার নিয়ম নেই। একজন পি. এম্. এস্. নেটিভ্ ডাক্তারের এই জবাব শুনে আই. এম্. এস্. শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার বার্ড সাহেবের ভারি রাগ হ'লো। উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন—না, হাত তুলে 'সেলাম' করাটাই নিয়ম। বিধানচন্দ্রের

প্রত্যুত্তর ঃ 'যদি ওই ধরনের নিয়ম থাকে, তাহ'লে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভবিষ্যতে আমি তা মেনে চলবো। আমার যিনি ওপরওয়ালা, সেই কর্নেল ল্যাকিসকেও আমি এই পোশাকে হাত তুলে 'সেলাম' জানাই না।' এর খানিক বাদেই বার্ড সাহেবকে কর্নেল ল্যাকিসের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেন ডাক্তার রায়। লক্ষ্য করলেন কর্নেল ল্যাকিসের মুখে তখন একটা চাপা হাসি। বার্ড চ'লে যাবার পর, কর্নেল ল্যাকিসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন বিধানচন্দ্র। তাঁর কাছ থেকে আদ্যোপান্ত সব শুনে, ল্যাকিস শান্তসহজ কণ্ঠে বললেন, 'দেখ বিধান, তুমি কর্নেল বার্ডের কাছে যেয়ো না ; ভবিষ্যতে দেখা হ'লে 'গুড্ মরনিং'-ও ব'লো না। এই শ্রেণীর কর্মচারীরাই তো ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সুনাম নষ্ট করছেন।'

পরে আর-একদিন কর্নেল ল্যাকিস বিধানচন্দ্রকে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, ইংরেজদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত সেই সম্পর্কে। কথাপ্রসঙ্গে সেদিন তিনি বলেছিলেন ঃ 'দেখ বিধান, আমি হয়তো চিকিৎসা-বিদ্যা তোমাকে খুব বেশি শেখাতে পারিনি ; কিন্তু একটা বিষয়ে আমার উপদেশ তুমি মনে রেখো। যখনই কোনো ইংরেজের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তার কাছে তুমি কখনো তোমার মেরুদণ্ড এক ইঞ্চির সিকিভাগও নত করবে না। কেননা, তা করলে সেই ইংরেজ তোমাকে নত করাবে দ্বিগুণ।' বিধানচন্দ্র তাঁর শিক্ষা-গুরুর সেই উপদেশ আজীবন মেনে চলেছিলেন।

দু'বছর কর্নেল ল্যাকিসের অধীনে কলকাতা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে চাকরি করতে করতেই বিধান এম্. ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণালব্ধ মৌলিক প্রবন্ধ বা 'থিসিস্' তৈরি করছিলেন। তার ফলে বাইরের চিকিৎসা করার জন্য শেষদিকে আর সময় পেতেন না। গবেষণামূলক সেই মৌলিক প্রবন্ধ রচনার জন্য, আর হাসপাতালে চাকরি ক'রে নিজের ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে

কিছু রোজগারের জন্য, সে-সময় দিনে তাঁকে সতেরো থেকে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। যাই হোক, তাঁর সে-পরিশ্রম সার্থক হ'লো শেষপর্যন্ত। ১৯০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এম্. ডি. ডিগ্রি লাভ করলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

এর পরের বছর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলেত-যাত্রা।

সে-ব্যাপারেও বিধান তাঁর শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে শুধু যে মৌখিক উৎসাহ ও প্রেরণার বাণী পেয়েছিলেন তা নয়, সক্রিয় সহযোগিতাও লাভ করেছিলেন। যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বা সামর্থ্য থাকলে বিলেতে গিয়ে পড়াশোনার কথা ভাবা যায়, সে-সময় সেই আর্থিক সামর্থ্য তাঁর আদৌ ছিল না। জাহাজের ভাড়া আছে, বিলেতে পড়বার খরচ আছে, থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে, জামা-কাপড় লাগবে, তাছাড়া বইপত্র এবং টুকিটাকি আরও নানা জিনিসের জন্য টাকার দরকার। তাও কি দু'-এক মাসের জন্য, কমপক্ষে দুটি বছর কাটাতে হবে লণ্ডনে। সাধারণ কোনো দরিদ্র ছাত্র হ'লে, মাত্র এক হাজার দু'শ টাকা সম্বল ক'রে বিলেতে যাওয়ার বাসনা সে অবিলম্বে ত্যাগ করতো। কিন্তু, দরিদ্র হ'লেও, বিধান তা ত্যাগ করেননি। প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রেই বড়ো হ'তে হবে—এই সংকল্প তাঁর তরুণ মনে দৃঢ়মূল ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর পরমহিতৈষী শিক্ষক কর্নেল ল্যুকিস।

কিন্তু প্রথম উদ্যোগেই বাধা!

বিধান সরকারি চাকুরে, মেডিকেল কলেজের সহকারী-সার্জন। কাজেই, বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করতে হ'লে, সরকারের কাছ থেকে ছুটি নিতে হবে। ছুটির জন্য তিনি নিয়মমাফিক দরখাস্তও করলেন। কিন্তু, তাঁর সেই আবেদন না-মঞ্জুর হয়ে গেল। কারণ দর্শানো হ'লো যে, সহকারী-সার্জনরূপে ডাক্তার রায় মাত্র দু'বছর কাজ করেছেন; তাই, সেদিক থেকে তাঁর তখনও কোনো ছুটি পাওনা

হয়নি। উপরন্তু, তিনি চেয়েছেন দু'বছর তিন মাসের জন্য ছুটি। সে-ছুটি বিনা বেতনে চাওয়া হ'লেও, সরকারি নিয়মে তা আদৌ মঞ্জুরযোগ্য নয়।

আবেদন না-মঞ্জুর হবার জন্য সাময়িক যে-বিষণ্ণতা এসেছিল বিধানচন্দ্রের মনে, তা কাটিয়ে উঠতে বিলম্ব হ'লো না। পরামর্শের জন্য তিনি চ'লে গেলেন কর্নেল ল্যাকিসের কাছে। ল্যাকিস সব দেখে-শুনে বললেন, ঠিক আছে, তুমি আবার একটা দরখাস্ত করো। তবে, এ-দরখাস্ত মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে নয়, একেবারে সরাসরি বাংলা প্রদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নর বা ছোটোলাটের কাছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে-সময়কার কথা আমরা এখানে আলোচনা করছি, সে-সময় ভারতের রাজধানী কলকাতাতে গভর্নর জেনারেল বা বড়ো-লাটও থাকতেন, ছোটোলাটও থাকতেন। বাংলা প্রদেশ তখন ছিল এক লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নরের শাসনাধীনে। কর্নেল ল্যাকিস সেই ছোটো-লাটের কাছেই দরখাস্ত করতে তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে পরামর্শ দিলেন। বললেন, দরখাস্তে এই কথাটা বেশ স্পষ্ট ক'রে লিখো যে, দু'বছর চাকরি পূর্ণ না-হলেও 'ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের' ক্ষেত্রে উচ্চ-শিক্ষালাভের জন্য ছুটি তো দেওয়া হয়েই থাকে, উপরন্তু তা সবেতন ছুটি। তাছাড়া, তাঁদের বেলায় সরকার থেকে একটা 'শিক্ষাভাতা'-ও দেওয়া হয়ে থাকে। তুমি সেক্ষেত্রে, বেতনও চাইছ না, শিক্ষাভাতাও চাইছ না—শুধু ছুটি চাইছ। কাজেই, তোমার আবেদনটি সরকার যেন সহানুভূতির সঙ্গে পুনর্বিবেচনা ক'রে তা মঞ্জুর করেন। বিধান তাই করলেন।

এদিকে তাঁর শিক্ষাগুরু তাঁর জন্য যে কী কাণ্ডকারখানা ক'রে বসলেন তা তিনি জানেন না। বরং এটাই তাঁর মনে হয়েছিল যে, বিলেত যাওয়া তাঁর আর হ'লো না। কেননা, তিনি 'প্রাদেশিক মেডিক্যাল সার্ভিসের' লোক, সর্বভারতীয় উচ্চতর মেডিক্যাল সার্ভিসের কোনো সদস্য নন। তাঁর আবেদন কি আর প্রদেশের শাসক-প্রধান

বিবেচনার যোগ্য ব'লে মনে করবেন! কিন্তু, কী আশ্চর্য, সেই অঘটনই ঘটলো। তরুণ ডাক্তার বিধানচন্দ্র একদিন একখানা চিঠি পেলেন 'হিজ অনার দি লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নর'-এর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছ থেকে। তাতে সুস্পষ্ট লেখা আছে 'হিজ অনার সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছেন এবং যথাবিহিত ব্যবস্থাদি করবার জন্য বেসামরিক হাসপাতালসমূহের সর্বাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন'—। বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রইলো না বিধানচন্দ্রের। মনে মনে শুধু ভাবলেন, কী ক'রে এমন অঘটন ঘটলো। তিনি অবশ্য জানতেন, কর্নেল ল্যুকিস এ-সব ক্ষেত্রে ভারতীয় ও প্রাদেশিক মেডিক্যাল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে কোনোরকম তারতম্য করা হোক, তা আদৌ পছন্দ করেন না। কিন্তু, কর্নেল ল্যুকিস যে তাঁর হয়ে ন্যায়সঙ্গত আবেদনটি পুনর্বিবেচনার জন্য নিজে গিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নরের সঙ্গে দেখা করবেন—অতটা তিনি আশা করেন নি। যখন সে-ব্যাপারটা টের পেলেন, তখন বিদেশী সেই শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর মাথা নত হয়ে এলো।

ছুটি তো মিললো। কিন্তু এবারে যে জাহাজ-ভাড়ার টাকা সংগ্রহের সমস্যা। টাকা তো সংগ্রহ করতেই হবে, কিন্তু তার আগে স্টীমার কোম্পানীর (সে-যুগে 'শিপিং কোম্পানী'-র বদলে 'স্টীমার কোম্পানী' কথাটাই বেশি চালু ছিল)—সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে কেবিনে বার্থ রিজার্ভেশন ক'রে রাখাটা একান্তই দরকার। কেননা, খোঁজ পেয়েছেন, তাঁর ছুটি যে-তারিখ থেকে শুরু হবে, তার পরের দিনই একটা জাহাজ ছাড়বে কলকাতা বন্দর থেকে। বার্থ তো রিজার্ভ করা হ'লো, কিন্তু যাত্রার তারিখের দশ দিন আগে তিনি যখন টিকেটের খোঁজখবর নিতে 'স্টীমার কোম্পানী'-কে ফোন করলেন, তখন তাঁরা জানালেন, যেহেতু তিনি একজন ভারতীয় যাত্রী, সেহেতু তাঁকে পুরো কেবিনটাই দখল ক'রে যেতে হবে এবং সেজন্য তাঁকে কেবিনের দুটো বার্থের জন্যই টিকেট কাটতে হবে, নয়তো আর-একজন ভারতীয়

সহযাত্রী জোগাড় ক'রে আনতে হবে। কেন? এ-ধরনের শর্ত কেন? কেন আবার,—কোনো কেবিনে ভারতীয় যাত্রী থাকলে, সে-কেবিনের অন্য বার্থে ইউরোপীয় কোনো যাত্রী যাবে না। কাজেই, ক্ষতি হবে স্টীমার কোম্পানীর। সেই ক্ষতি যাতে না হয়, সেইজন্যই স্টীমার কোম্পানীর ইংল্যাণ্ডের সদরদপ্তর থেকে এই রকমের নির্দেশ আছে।

আবার একটা মানসিক ধাক্কা খেলেন বিধান। তিনি জানালেন, —দেখুন, একা আমার জন্য দুটো বার্থের ভাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, এত কম সময়ের মধ্যে আর-একজন ভারতীয় যাত্রী জোগাড়ই বা করবো কী ক'রে! টেলিফোনের ওধার থেকে বিলিতী জাহাজ-কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী কেতাদুরস্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তাহ'লে আর এই তারিখের জাহাজে আপনার জন্য কোনো বার্থ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'লো না।' তখন বড়োই দুর্ভাবনার মধ্যে পড়লেন বিধান। অথচ, এই জাহাজ চ'লে গেলে, অন্য জাহাজে রওনা হ'তে শুধু বিলম্বই হ'বে না, ছুটির মেয়াদও ক'মে আসবে।

বিলিতী জাহাজ-কোম্পানীর সেই শর্তের কথা শুনে, খাস বিলেতের মানুষ কর্নেল ল্যাকিস তো একেবারে খাপ্পা। না—না, এ হ'তে পারে না, এর প্রতিবাদ করতেই হবে। কেন, একজন ভারতীয়ের সঙ্গে একই কেবিনে সহযাত্রী হয়ে একজন ইংরেজ যাবে না কেন— তার আপত্তিটা কিসের? ভারতীয়ের গায়ের চামড়ার রঙ্ তার গায়ের চামড়ার রঙের তুলনায় কালো হ'লেও, ভারতীয়েরা তো সাধারণত ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। না, না, এ-সব বরদাস্ত করা যায় না। ছাত্রবৎসল, মানবদরদী কর্নেল ল্যাকিস তখন নিজেই ছুটলেন সেই জাহাজ-কোম্পানীর জেনারেল-ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। শুধু দেখাই করলেন না, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সেই জাহাজেই একটি বার্থ দিতে হবে ব'লে গোঁ ধরলেন। শেষপর্যন্ত, তাঁরা রাজী হলেন বটে, কিন্তু শর্ত করিয়ে নিলেন যে, ডাক্তার রায়ের

কেবিনে পরে আর কোনো যাত্রীকে নেওয়া চলবে না। অর্থাৎ, একা একাই থাকতে হবে কর্নেল ল্যুকিসের ছাত্রটিকে! এই প্রসঙ্গে ডাক্তার রায় তাঁর অন্যতম জীবনীকার কে. পি. টমাসের কাছে বলেছেন: "ব্রিটিশদের সঙ্গে সেই ঘটনার সূত্রে বাদানুবাদ হওয়ায় আমার আত্ম-বিশ্বাস যেন আরও বেড়ে গেল। এই ধরনের প্রতিটি ঘটনায় আমার তাৎক্ষণিক সমস্যার শুধু সমাধানই হয়নি, বিদেশীদের সঙ্গে যে-কোনো বিষয় নিয়ে লড়াই করবার মতো আত্ম-প্রত্যয় আমার জন্মেছিল।"

যাই হোক, সেই আত্মবিশ্বাসের ওপরে ভর ক'রে, নিতান্ত দুঃসাহসী এক তরুণ অভিযাত্রীর মতোই, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মনোভাব নিয়ে, বিধানচন্দ্র ১৯০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি 'সিটি অব গ্ল্যাসগো' জাহাজে চেপে ইংলণ্ড অভিমুখে পাড়ি দিলেন। জাহাজ-ভাড়া বাদে, তাঁর স্বোপার্জিত ও সঞ্চিত মাত্র বারশো টাকা ছিল তাঁর সঙ্গে। তখনও তিনি জানতেন না যে, যে-দুটি পরীক্ষায় পাস করবার জন্য তিনি বিলেতে যাচ্ছেন, সে-দুটি পরীক্ষার ফী-ই আশি গিনি অর্থাৎ, বারশো টাকার মতো!

মার্চ মাসের শেষাশেষি বিধানচন্দ্র গিয়ে পৌঁছুলেন লণ্ডনে।

শিক্ষাগুরু কর্নেল ল্যুকিসের পরামর্শ মতো তিনি বিলেত গিয়েছিলেন চিকিৎসা-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ দুটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একজন সত্যিকারের ভালো ডাক্তার হ'তে। সে-দুটি পরীক্ষা কী? না, এম. আর. সি. পি. (লণ্ডন); আর, এফ. আর. সি. এস্. (ইংল্যাণ্ড)। অর্থাৎ, মেম্বার অব্ দি রয়াল কলেজ অব্ ফিজিশিয়ান্‌স্ (লণ্ডন); আর, ফেলো অব্ দি রয়াল কলেজ অব্ সার্জন্‌স্ (ইংল্যাণ্ড)। প্রথমটি হলো মেডিসিন বা ওষুধ-নির্ধারণের এবং দ্বিতীয়টি হলো 'সার্জারী' বা শল্য-চিকিৎসার উচ্চতম ডিগ্রী লাভের পরীক্ষা।

বিধান জানতেন, কর্নেল ল্যুকিস এবং কলকাতা মেডিক্যাল

কলেজের আরও সব নামকরা অধ্যাপক লণ্ডনের সেণ্ট বার্থলমিউজ হাসপাতাল ও কলেজ থেকে চিকিৎসা-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়েছেন। কাজেই, সেই হাসপাতাল-কলেজেই তিনি পুথিগত ও হাতেকলমের বাস্তবসম্মত শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা দেবেন। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে তিনি সেণ্ট বার্থলমিউজ হাসপাতাল-কলেজের ডীনের কাছে লেখা কর্নেল ল্যুকিস ও অন্যান্য ইংরেজ অধ্যাপকদের যে-পরিচয়পত্রগুলি জোগাড় ক'রে নিয়েছিলেন, এবারে সেগুলি সঙ্গে নিয়ে সোজা চ'লে গেলেন কলেজের ডীন ডঃ শোরের সঙ্গে দেখা করতে।

লণ্ডনে পৌঁছেই বিধানচন্দ্র খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছিলেন, লণ্ডনে যে-কয়টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে, সেগুলির মধ্যে সেণ্ট বার্থলমিউজ হাসপাতাল-কলেজের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ভার সবচেয়ে বেশি এবং তাঁর মতো দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে সে-ব্যয়ভার বহন করা নিতান্তই দুষ্কর। তবু, সংকল্প তাঁর—ওই কলেজেই পড়বেন।

ডঃ শোর তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং পরিচয়পত্রগুলি দেখেও বুঝতে পারলেন যে, নবাগত এই ভারতীয় শিক্ষার্থীটি বিশেষ গুণী। কিন্তু মাথা নেড়ে সুস্পষ্ট ভাষায় ব'লে দিলেন—না, এ-কলেজে তোমাকে ভরতি ক'রে নেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়, তুমি বরং লণ্ডনের অন্য কোনো মেডিকেল কলেজে চেষ্টা ক'রে দেখ।

ডঃ শোর যে এমন একটা কাঠখোট্টা জবাব দেবেন, বিধান তা কল্পনাও করেন নি। আবার একটা মানসিক ধাক্কা খেলেন। পদে-পদে এতদিন তো বেশ কয়েকবার বাধার সম্মুখীন হয়ে, সে-সব বাধা অতিক্রম ক'রে, সাগর-মহাসাগর ডিঙিয়ে এতদূর পর্যন্ত এলেন। শেষপর্যন্ত কি বিফল-মনোরথ হয়েই ফিরে যেতে হবে! না, কখনোই না। পণ ক'রে যখন এসেছি, তখন এই কলেজেই পড়ব। তাঁর সেই স্বগতোক্তি ডঃ শোর শুনতে পেলেন না বটে, কিন্তু পরে টের পেলেন ভারতীয় এই শিক্ষার্থীটি কী অসীম মনোবলের অধিকারী।

কয়েকদিনের মধ্যে, আরও দু'বার, ভরতির অনুরোধ নিয়ে, তরুণ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ডঃ শোর-এর সঙ্গে দেখা করলেন।

ডঃ শোর জিজ্ঞাসা করলেন—চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে কতদিন থাকবে ঠিক করেছ?

—দু'বছর তিন মাসের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছি। এই সময়ের মধ্যেই পড়াশোনা ক'রে আমি এম্. আর. সি. পি. (লণ্ডন) আর এফ্. আর. সি. এস্. (ইংল্যাণ্ড) পরীক্ষা দুটি দিতে চাই।

সে-কথা শুনে ডঃ শোর তো একেবারে তাজ্জব। এত কম সময়ের মধ্যে এমন দু'-দুটি কঠিন পরীক্ষা কখনো কি দেওয়া সম্ভব!! প্রকাশ্যে বললেন—ইংল্যাণ্ডে এমন ছাত্র খুব কমই আছে, যারা একসঙ্গে এ দুটি পরীক্ষায় পাস ক'রে ডিগ্রী পেয়েছে। তুমি দেখছি বড্ড বেশি উচ্চাভিলাষী!

বিধান কিন্তু এই বক্রোক্তিতে আদৌ দমলেন না। বরং সাহস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে বললেন—সঠিক পথে পরিচালিত উচ্চাভিলাষ ছাড়া এ জগতে কেউই কোনোদিন অভীষ্ট লাভে সফল হন নি।

নাঃ, এতেও হ'লো না।

ডঃ শোর বিধানকে তাঁর কলেজে ভরতি ক'রে নিতে এখনও অসম্মত। ঠিক আছে, আবার আসব—এই রকমের একটা মনোভাব নিয়ে বিধান সেদিনকার মতো বিদায় নিলেন। তার পর শুধু একবার নয়, দেড় মাসের মধ্যে কম ক'রে ত্রিশ বার এলেন একই আবেদন নিয়ে—অনুগ্রহ ক'রে আমাকে এই কলেজে পড়বার সুযোগ ক'রে দিন, ভরতি ক'রে নিন।

অবশেষে ডঃ শোর গম্ভীর হয়ে একদিন বললেন, আচ্ছা যাও, কাল এসো ভরতি হবার ফী সঙ্গে নিয়ে। সাহেবের কথা শুনে বিধানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ধৈর্যের সঙ্গে এতদিন চলছিল লড়াই, সে-লড়াইয়ে জিতলেন তিনি। কিন্তু, ভরতি-ফীর অঙ্কটা মনে পড়তেই বিধানের কেমন যেন ভাবান্তর

হ'লো। চল্লিশ গিনি জমা দিতে হবে বার্ষিক ফী বাবদ। অর্থাৎ, প্রায় ছ'শ টাকা একসঙ্গে। আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে, কোনোরকম দ্বিধা না ক'রে, বিধান বললেন—অনুগ্রহ ক'রে আপাতত আগাম তিন মাসের ফী জমা দেবার অনুমতি দিন, স্যর। পরে, যথাসময়ে—

ডঃ শোর কোনো আপত্তি করলেন না সেই প্রস্তাবে। পরদিন, সেই টাকা, অর্থাৎ দশ গিনি, জমা দিয়ে বিধানচন্দ্র ভরতি হয়ে গেলেন সেণ্ট বার্থলমিউজ হাসপাতাল-কলেজে।

কলেজে ভরতি হয়েই বিধানচন্দ্র সংকল্প নিলেন, এই কলেজে যতদিন আছেন ততদিন যত বেশি পারেন চিকিৎসা-বিষয়ে সবকিছু শিখে নেবেন। কেননা, ছুটির মেয়াদ যেমন সীমিত, সঙ্গের পুঁজিও তেমনি সীমাবদ্ধ। কাজেই, ফাঁকি দিলে চলবে না, আরাম করলে চলবে না, আর্থিক সম্বলের দিকে তাকিয়ে খরচ করতে হবে। অধ্যবসায় আর মিতব্যয়িতা যেন হাত ধরাধরি ক'রে এসে তরুণ ভারতীয় ছাত্রটিকে ঘিরে ধরলো। তার সঙ্গে অবশ্য সহজাত একনিষ্ঠা ও মেধাও ছিল বৈকি।

এফ্. আর. সি. এস্. পরীক্ষার দুটি বিষয় অ্যানাটমি (শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যা) আর ফিজিওলজি (শারীর বিদ্যা)। ওই দুটি পরীক্ষা দেবার আগে ডাক্তার রায় মনস্থ করলেন, আর-একবার মানবদেহ কাটাকুটি ক'রে দেখে নেবেন কোথায় কী আছে এবং কাটাকুটিটা ঠিকমতো করতে পারেন কি না। কেননা, কলকাতায় থাকতে মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে তিনি যে-সব ডিসেক্শন বা শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা-কুটি করেছিলেন সে তো প্রায় পাঁচ-ছ' বছর আগেকার ব্যাপার। এতদিনের ব্যবধানে সব যেন ঠিকমতো মনে নেই। সঙ্গীও জুটে গেল একজন। সতীর্থটি ভেনেজুয়েলার এক চিকিৎসক-শিক্ষার্থী। তাঁরও ইচ্ছা অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যেটা একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করেন।

লণ্ডনে মেডিকেল শিক্ষানিকেতনগুলিতে মে ও জুন মাসে একেবারে ছুটির পরিবেশ। সে-সময়ে সাধারণত কোনো ছাত্রই কলেজে যোগ দেয় না। তাতে বেশ সুবিধাই হয়ে গেল ভারতীয় ও ভেনেজুয়েলার ছাত্র দুটির। তাঁরা দু'জনে মিলে সকাল দশটা থেকে শবদেহ কাটা-কুটি করেন, আর একটানা কাজ চালিয়ে যান বিকেল পাঁচটা অবধি। দুপুরের খাওয়া বা লাঞ্চ তাঁদের কারুরই হয় না। লাঞ্চের জন্য পয়সার অভাব, তাই বিধানের খাওয়া হয় না। আর, ভেনেজুয়েলার ছাত্রটির লাঞ্চ-খাওয়ারই অভ্যাস নেই। কাজেই, সময় চ'লে যায় একাগ্রভাবে শব-ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে, শল্য-চিকিৎসার পাঠ আয়ত্ত করবার মধ্য দিয়ে। একবেলা না খেলে, কী এমন এসে যায়! বিধানচন্দ্র যেন মনে মনে নিজেকে সেই কথা ব'লেই সান্ত্বনা দেন।

এইভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে করতে, ডাক্তার রায় অনেক কিছু আরও ভালোভাবে, যাকে বলে একেবারে নিখুঁত ক'রে, শিখেছিলেন। কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়বার সময় চর্মরোগ চিকিৎসার শিক্ষণটা খুব ভালোমতো হয় নি ব'লে, তিনি সেণ্ট বার্থলমিউজ কলেজের চর্মরোগ বিষয়ের অধ্যাপকের কাছে গিয়ে, তাঁর একজন অবৈতনিক চিকিৎসা-সহকারী রূপে, হাতেকলমে সব শিখতে লাগলেন। সপ্তাহে তিন দিন সকাল আটটা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত সেই কাজে ব্যয় করেন বিধানচন্দ্র। আর, দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত 'অ্যানাটমি হলে' ডিসেক্‌শনের ব্যাপারটা তো ছিলই। সারাটা দিন এইভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'তো ব'লে, পাঁচটার পর ক্লান্তি যেন নেমে আসতো সারা দেহে—বিধান তখন সোজা চ'লে যেতেন তাঁর বাসায়।

লণ্ডনে যে-বাড়িতে তিনি থাকতেন, সে-বাড়ির গৃহকর্ত্রী বা ল্যাণ্ড-লেডি তাঁর প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করতেন। সে-বাড়িতে গিয়ে ওঠবার দিন কয়েক পরেই একদিন সেই ইংরেজ ভদ্রমহিলার শিশুকন্যা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, ভারতীয় তরুণ ডাক্তার বি. সি. রায় কোনো

ফী না নিয়েই তার চিকিৎসা করেন। দিন কয়েকের মধ্যে সেই ছোট্ট মেয়েটি তাঁর চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সেরে উঠলে গৃহকর্ত্রী স্বভাবতই খুশী হন এবং বিধানচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করেন। সেই কৃতজ্ঞতার সূত্রেই তিনি বিধানচন্দ্রের কাছ থেকে সপ্তাহে মাত্র ষোল শিলিং নিতেন ঘরভাড়া হিসেবে। এতে বিধানচন্দ্রেরও আর্থিক দিক থেকে অনেকটা সুরাহা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যে-দু'বছর তিন মাস তিনি সেই বাড়িতে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে নিজগুণে তিনি সেই পরিবারের সকলের কাছ থেকেই যথাসম্ভব তত্ত্বতল্লাশ ও সহৃদয় ব্যবহার লাভ করেছেন।

বিলেতের শিক্ষার্থী-জীবন প্রকৃতপক্ষে বিধানচন্দ্রের কাছে ছিল এক তপস্যার জীবন। প্রথমত পড়াশোনার মধ্যে ডুবে থাকা, দ্বিতীয়ত আর্থিক সীমাবদ্ধতা—এই দুই কারণে সে-সময় তাঁর পক্ষে লোক-লৌকিকতা বা সামাজিকতার প্রতি মন দেওয়া সম্ভব ছিল না। পয়সার অভাবে ঘুরে-ফিরে শহর দেখা, ট্রেনে বা বাসে এখানে-ওখানে যাওয়া, এ-সব তো দূরের কথা, ভালো ক'রে রোজ খাওয়াই হ'তো না তাঁর। দুপুরের আহার তো বহুদিনই বাদ গেছে, তাছাড়া সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এক-কাপ চা ও একটু জলখাবার,—তাও তিনি অনেক দিন বাদ দিয়েছেন, দিতে বাধ্য হয়েছেন। এইভাবে আরাম, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য নির্বিকারচিত্তে ভুলতে পেরেছিলেন ব'লেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি।

নিজের আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও বিধানচন্দ্র তাঁর সেই বিলাত প্রবাসকালে কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ঋণ-গ্রহণও করেন নি। বরং, আত্মবিশ্বাসী বিধানচন্দ্র তাঁর অতুলনীয় মানসিক দৃঢ়তায়, পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারি ক'রে কিছু কিছু উপার্জনও করেছেন। যেমন, প্রায়ই তিনি তিন-চার দিনের জন্য লণ্ডনের বাইরে গিয়ে কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিকের ছুটি-নেওয়া ডাক্তারের জায়গায় কাজ ক'রে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

এইভাবে বুঝেসুঝে চলতেন এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করতেন ব'লেই তিনি শিক্ষালাভের সেই সংগ্রামে জয়ীও হয়েছেন।

দু'মাস ধ'রে শবদেহে ছুরি চালিয়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটাকুটি ক'রে, বিধান ও তাঁর সহপাঠী ভেনেজুয়েলার সেই ছাত্রটি নিজেদের শিক্ষালাভ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন। এবারে প্রশ্ন উঠলো, এতদিন ধ'রে যে-শবদেহটির মাধ্যমে তাঁরা এত কিছু শিখতে পারলেন, সেই শবদেহটির জন্য টাকা তো দিতে হবে! অ্যানাটমি-হলের ট্যাক্সিডারমিস্ট (অর্থাৎ, যিনি চর্মসংরক্ষণ বিদ্যাভিজ্ঞ) মিঃ হ্যালেটের কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন, শবদেহটির জন্য তাঁদের দিতে হবে বারো গিনি, অর্থাৎ প্রায় দু'শো পঁচিশ টাকা। টাকার অঙ্ক শুনে তো বিধানের চক্ষু চড়কগাছ! তাঁর মনে প'ড়ে গেল কলকাতা মেডিকেল কলেজের কথা। সেখানে তো মাত্র ছ'টাকাতেই একটা মৃতদেহ পাওয়া যেতো। এখানে দু'জনে মিলে আধাআধি দিলেও তো একশো টাকার ওপরে লাগবে। বড়োই এক সমস্যার মধ্যে পড়লেন বিধানচন্দ্র। সারারাত ঘুম হ'লো না ভালো ক'রে।

পরদিন তিনি সোজা চ'লে গেলেন অ্যানাটমির প্রফেসর, ডঃ অ্যাডিসনের সঙ্গে দেখা করতে। সব শুনে, মৃদু হেসে ডঃ অ্যাডিসন বললেন—অত ভাবছ কেন এ নিয়ে? শোনো, যে-শবদেহ নিয়ে তোমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছ, তার জন্য তোমাদের কোনো দাম-ই দিতে হবে না।

অবাক্-বিস্ময়ে শিক্ষার্থী ডাক্তার বিধান চোখ তুলে তাকালেন তাঁর সেই অধ্যাপক ডঃ অ্যাডিসনের দিকে। প্রথমেই তাঁর মনে হ'লো, সাহেব যেন তাঁর প্রতি নিতান্ত করুণা ক'রেই অমন কথা বললেন। কেননা, তাঁর পরনের সাধারণ পোশাক দেখলে যে-কোনো

লোকই বুঝবে, তিনি একজন গরিব ছাত্র,—বেশি টাকা খরচ করবার মতো তাঁর কোনো সামর্থ্যই নেই। কিন্তু, এভাবে করুণা গ্রহণ করতে বিধান আদৌ রাজী নন। তিনি সবিনয়ে তাঁর অধ্যাপককে বললেন, না স্যর, টাকা আমি দেব, বিনামূল্যে কেন—

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে, অধ্যাপক ডঃ অ্যাডিসন বললেন: তোমার কি মনে আছে, তিন মাসে আগে, এই কলেজে ভরতি হ'তে এসে তুমি কী অসুবিধার মধ্যেই-না পড়েছিলে? বার বার কতবারই না গেছ ডীনের কাছে, কিন্তু তিনি তোমাকে ভরতি ক'রে নিতে রাজী হন নি?

বিধানচন্দ্র কৌতূহলী হয়ে উঠলেন বাকি কথা শোনবার জন্য।

ডঃ অ্যাডিসনের কাছ থেকে তিনি আর যা শুনলেন, সংক্ষেপে তা হ'লো এই,—কলেজে ছাত্র ভরতি করার ব্যাপারে যে নির্বাচক-মণ্ডলী রয়েছেন ডঃ অ্যাডিসনও তার একজন সদস্য। কলেজের ডীন প্রায়ই তাঁকে বলতেন যে, বাংলা থেকে নাছোড়বান্দা এক তরুণ এসেছে, সে কেবল এই কলেজেই ভরতি হ'তে চায়, অন্য কলেজে নয়। কিন্তু, ডীন তার জন্য এ-কলেজে কোনোমতেই ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারছেন না। সব শুনে, ডঃ অ্যাডিসন একদিন ডীন ডঃ শোরকে বলেছিলেন, বাঙালী সেই ছেলেটির যখন এতই আগ্রহ এই কলেজে পড়বার, তখন তাকে একটা সুযোগ ক'রে দিলে ক্ষতি কী? বস্তুত ডঃ অ্যাডিসনের কথাতেই ডঃ শোর শেষপর্যন্ত বিধানকে সেন্ট বার্থলমিউজে ভরতি ক'রে নেন। আর, সেই কারণেই ডঃ অ্যাডিসন বিধানের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তিনি জানতেন, বিধান ও ভেনেজুয়েলার সেই ডাক্তার ছাত্রটি রোজ অ্যানাটমি হলের ডিসেক্শন-রুমে গিয়ে শবদেহ কাটা-কুটি ক'রে পরীক্ষা চালান। ডঃ অ্যাডিসনও মাঝে-মাঝে, তাঁদের আসবার আগে, খুব ভোরে গিয়ে, সেই ডিসেক্শন-রুমে ঢুকে শবদেহের কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাণ্ডেজ খুলে লক্ষ করেন তাঁদের কাজ ঠিকমতো এগোচ্ছে কি না। বাঃ, এ যে একেবারে নিখুঁত কাটাকুটি।

চমৎকার ডিসেক্‌শন। কাজেই, ডঃ অ্যাডিসন মনে মনে সেই দুটি ভিনদেশীয় শিক্ষার্থীর ওপর সন্তুষ্ট না হয়ে পারেন নি। শুধু তাই নয়, ডঃ অ্যাডিসনের একথাও মনে হয়েছিল যে, ওরা যেভাবে শবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটাকুটি ক'রে রেখেছে, অ্যানাটমির ছাত্রদের কাছে তা অনায়াসেই দেখানো যায় এবং বোঝানো যায়। সেই সঙ্গে এ-কথাও তাঁর মনে পড়েছিল যে, কলেজের মাইনে-করা ডিমনস্ট্রেটররা ছাত্রদের শেখাবার জন্য শবদেহ কাটাকুটি করলে তাঁদের কাছ থেকে তো শবদেহ বাবদ কোনো ফী নেওয়া হয় না, —তাহ'লে এই ছাত্র দুটির কাছ থেকেই-বা নেওয়া হবে কেন?

ডঃ অ্যাডিসন যে সমস্ত ব্যাপারটা এমন একটা বাস্তবসম্মত দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখেছেন, সেই কথা ভেবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে গেল বিধানচন্দ্রের। এই ডঃ অ্যাডিসন ছিলেন সে-যুগের একজন বিশ্ববিখ্যাত অ্যানাটমিস্ট। ১৯১০ সালে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য নির্বাচিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি একজন মন্ত্রীও হয়েছিলেন। পরে তাঁকে 'লর্ড'-এর পদমর্যাদাও দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে পরে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের যে হৃদ্যতা গ'ড়ে ওঠে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত, অর্থাৎ ডঃ অ্যাডিসনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত, তা ছিল অটুট।

ইতিমধ্যে তিন মাস কেটে গেছে।

বিধান একদিন ডঃ শোর-এর সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রে বললেন—স্যর, এবারে আমি পরবর্তী তিনমাসের জন্য কলেজ-ফী নিয়ে এসেছি।

সে-কথার জবাবে ডঃ শোর যে-কথা বললেন, তা শুনে বিধানচন্দ্র তো একেবারে অবাক্! কী বললেন ডঃ শোর? বিধানচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে শান্ত মধুর কণ্ঠে তিনি বললেন—এখন থেকে, তোমার কাছ থেকে কলেজ আর কোনো ফী-ই নেবে না। তুমি যতদিন এই কলেজে রয়েছ, স্বচ্ছন্দে প'ড়ে যাও, পরীক্ষার জন্য তৈরী হও।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র মনে মনে ভাবলেন, কী ব্যাপার! যে ডঃ শোর একদিন তাঁর ভরতির ব্যাপারে বারংবার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁরই মুখে আজ দেখছি একেবারে অন্য সুর! কিন্তু, বিধান তো এভাবে অনুগ্রহ নিতে পারেন না, আর নেবেনই বা কেন? ফী দেবার মতো টাকা তো তাঁর সঞ্চিত ভাণ্ডারেই আছে।

বিধানচন্দ্রের মনের ভাব সহজেই আঁচ ক'রে নিতে পেরেছিলেন ডঃ শোর। তাই, কেন তাঁকে এখন থেকে আর কলেজের ফী দিতে হবে না, তার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণও বুঝিয়ে বললেন সেণ্ট বার্থলমিউজের ডীন। তিনি এটা বেশ ভালো ক'রেই লক্ষ করেছিলেন যে, বাঙালী এই তরুণ শিক্ষার্থীটি ইতিমধ্যে পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে তৈরী হচ্ছে, তেমনি কলেজের চর্মরোগ-বিভাগে একজন ক্লিনিক্যাল-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসাবেও কাজ করছে মন দিয়ে, অথচ কোনো পারিশ্রমিক নিচ্ছে না। ডঃ শোর জানতেন, চর্মরোগ-বিভাগের একজন ক্লিনিক্যাল-অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে বছরে ষাট পাউণ্ড (অর্থাৎ, প্রায় ৫৮ গিনি বা ৮৪০ টাকার মতো) অ্যালাউন্স বা ভাতা দেওয়া হয়। কাজেই, বিধান যতদিন পড়াশোনা করবেন ও সেইসঙ্গে ক্লিনিক্যাল-অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাজ বিনা ভাতায় ক'রে যাবেন, ততদিন তাঁর কাছ থেকে তো কলেজের ফী বাবদ আর কিছু নেওয়াই চলে না। এ তো সহজ একটা অঙ্কের হিসাব। অর্থাৎ, তুমি যেমন বিনা বেতনে কলেজের একটা কাজ ক'রে দিচ্ছ, আমরাও তেমনি ফী না নিয়ে তোমাকে পড়াব, পরীক্ষা দিতে দেব।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার রায়ের নিজের কথা: "সে এক অত্যাশ্চর্য পরিস্থিতি। আমি অনুভব করলাম বিলেতে সেই ট্রেনিং নেওয়ার সময় বিধাতা তাঁর অদৃশ্য হাত দিয়ে আমাকে যেন আমার সেই অর্থাভাবের মধ্যে ওইভাবে সাহায্য ক'রে চলেছেন।" কথায় বলে না—'ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়'—এও যেন সেই রকম। টাকা-পয়সার এত টানাটানি সত্ত্বেও, ডাক্তার রায় এইভাবে নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে

আর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় শেষপর্যন্ত কৃতকার্য হলেন। তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধি হ'লো। দু'বছর পড়াশোনা ক'রে, একই সঙ্গে তিনি ১৯১১ সালের মে মাসে 'এম্. আর. সি. পি.' আর 'এফ্. আর. সি. এস্.' পরীক্ষায়, তাঁর অধ্যাপকদের অবাক্ ক'রে দিয়ে, কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হলেন। 'এম্. আর. সি. পি' পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সকল ছাত্রের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন।

তারপর, যেদিন সকৃতজ্ঞ চিত্তে ডঃ শোরকে তাঁর সহযোগিতা ও সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে গেলেন, সেইদিনই প্রথম জানতে পারলেন ডঃ শোর গোড়ার দিকে কেন তাঁকে বারবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সেণ্ট বার্থলমিউজ হাসপাতাল-কলেজের ডীন বা সর্বপ্রধান ডঃ শোর সেদিন তাঁকে বলেছিলেন ঃ ডক্টর রায়, তুমি যেদিন প্রথম আমার কাছে এসেছিলে, সেদিন এই প্রতিষ্ঠানে তোমাকে ভরতি ক'রে না নিয়ে আমি তোমার প্রতি যে-ব্যবহার করেছিলাম, সেজন্য আমি সত্যিই লজ্জিত। তুমি বাংলা থেকে এসেছিলে ব'লেই আমি তোমার দরখাস্ত বাতিল ক'রে দিয়েছিলাম। কেননা, বাঙালী ছাত্রদের ব্যাপারে আমাদের যে-অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয়েছিল, তা সুখের নয়। তাই ভেবেছিলাম, তোমাকে যদি ভরতি ক'রে নেওয়া হয়, তাহ'লে তুমিও হয়তো আবার এই কলেজের ঐতিহ্য নষ্ট করবে। সেই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানে তোমার প্রবেশে আমি বাধা দিয়ে এসেছি। কিন্তু, আজ আমি সানন্দে এ-কথা বলতে পারি যে, যে-মুষ্টিমেয় ক'জন ছাত্র এত অল্প সময়ের মধ্যে এ দুটো ডিগ্রী লাভ করেছে, তুমি তাদের অন্যতম। আর, ঠিক সেই কারণেই আমি আমার আগেকার ব্যবহার শুধ্‌রে নেবো ব'লে স্থির করেছি। ভবিষ্যতে তোমার দেওয়া পরিচয়-পত্র নিয়ে যে-ছাত্রই আসুক না কেন, তাকে আমি কোনোরকম জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রেই ভরতি ক'রে নেবো।"

সব শুনে, ডাক্তার বিধানচন্দ্রের চোখ দু'টি আনন্দাশ্রুতে ভ'রে

উঠেছিল সেদিন। তাঁর মনে আর কোনো ক্ষোভ ছিল না। একসময় পশ্চিমবাংলা তথা ভারতে এমন বহু খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন, এবং এখনও হয়তো আছেন, যাঁরা একদা ডাক্তার বিধানচন্দ্রের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে গিয়ে বিলেতের সেই বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

বিলেতে উচ্চশিক্ষা লাভের পর, দেশে ফিরে আসবার সময়েও আবার বাধার সম্মুখীন হ'তে হলো। কী ক'রে দেশে ফিরবেন? জাহাজ-ভাড়ার টাকা কোথায়? পকেট যে একেবারে খালি। বাধ্য হয়ে ধার নিতে হ'লো এক ভারতীয় বন্ধুর কাছ থেকে। তা থেকে সতেরো পাউণ্ড দিয়ে তিনি কলম্বো পর্যন্ত জাহাজের একখানা টিকিট কাটলেন। তারপর চার পাউণ্ড লাগলো কলম্বো থেকে কলকাতার ভাড়া। মাদ্রাজে যখন এসে পৌঁছুলেন তখন দেখেন সঙ্গে আছে মাত্র পনেরোটি টাকা। তা থেকেও দশটি টাকা চ'লে গেল সহযাত্রী এক অভাবী বন্ধুকে সাহায্য করতে। কাজেই, মাত্র পাঁচ টাকা সম্বল ক'রে বাংলা, তথা ভারতের, ভবিষ্যৎ ধন্বন্তরি ডাক্তার বিধানচন্দ্র কলকাতায় এসে নামলেন, ১৯১১ সালের জুলাই মাসে।

সেই বছর ডিসেম্বর মাসেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটলো।

৩

এবারে মাতৃপিতৃহীন বিধানচন্দ্রের শুরু হ'লো কর্মজীবন।

তাঁর সেই একান্ন বৎসর ব্যাপী (১৯১১-৬২) কর্মজীবনের ইতিহাস মূলত এক মানবদরদী চিকিৎসকেরই ইতিহাস। যেখানেই অসুস্থতা সেখানেই তিনি। তা সে হাসপাতালেই হোক, গৃহস্থের বাড়িতেই হোক, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়, পৌরসভা, জাতীয় কংগ্রেস, অথবা রাজ্য-প্রশাসনের-ক্ষেত্রেই হোক। অসুস্থকে সুস্থ করতে, মুমূর্ষুকে জীবন দান করতে তিনি যেমন বরাভয়-মূর্তিতে আবির্ভূত হতেন, তেমনি তাঁর কাছ থেকে বিধান পেতে বিশ্ববিদ্যালয়, পৌরসভা, জাতীয় কংগ্রেস তথা স্বরাজ্য-পার্টি সকলেই ছিল উদ্‌গ্রীব। সকলেই বুঝেছিল ডাক্তার বিধানচন্দ্র শুধু শারীরিক রোগ সারাতেই ওস্তাদ নন, তাঁর চিকিৎসকের চোখে সমাজের ও দেশের রোগগুলিও যেন ক্রমশ ধরা পড়ছে, আর তিনি সেগুলিকেও নিরাময় ক'রে তুলতে পারবেন, তাঁর সে-ক্ষমতা আছে। হ্যাঁ, সে-ক্ষমতা ছিল ব'লেই তিনি ছেষট্টি বছর বয়সেও, ব্যক্তিগত লাভালাভ, আরাম-সুখ সবকিছু ভুলে স্বাধীনোত্তর সমস্যাজর্জরিত পঙ্গু পশ্চিমবঙ্গকে নবজীবন দান করতে উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন।

বিধানচন্দ্রের কর্মজীবনকে আমরা দু'ভাগে ভাগ ক'রে দেখতে পারি। প্রথম ভাগে দেখতে পারি স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ, ১৯১১-৪৭ সাল পর্যন্ত) তাঁর জীবনের কর্মধারা কিভাবে চলেছে, আর দ্বিতীয় ভাগে দেখতে পারি স্বাধীনতা-লাভের

পরবর্তী কালের (অর্থাৎ, ১৯৪৮-৬২ সাল পর্যন্ত সময়কার) কর্ম-প্রবাহের স্বরূপত্ব।

বিধানচন্দ্র, বিলেত থেকে কলকাতা ফিরে, একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন ৮৪, হ্যারিসন রোডে (এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোডে)। উদ্দেশ্য, সেখান থেকে কাছেই মেডিকেল কলেজে গিয়ে অধ্যাপনা করবেন, আর বাকী সময় সেই বাড়িতে ব'সেই ডাক্তারি করবেন। তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সফল হ'লেও, প্রথম উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হ'লো না। ইংরেজ রাজপুরুষদের অসঙ্গত ব্যবস্থায়, তিনি বিলেতের দু'-দুটি সর্বোচ্চ ডিগ্রী পাওয়া সত্বেও, মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকের কোনো পদ পেলেন না। তার বদলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে পূর্ব-পদে (অর্থাৎ, মেডিকেল কলেজের সহকারী-সার্জন-পদে) বহাল রেখে, তাঁকে কলকাতা পুলিসের কন্‌স্টেবলদের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত করলেন। বলা বাহুল্য, এ-কাজ তাঁর মতো একজন উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক-বিজ্ঞানীর উপযুক্ত কাজ নয়, এ-কাজ যে-কোনো একজন সাধারণ ডাক্তারকে দিয়েও করানো যেতো। যাই হোক, মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেও, শৃঙ্খলা ও কর্তব্যের খাতিরে, ডাক্তার রায় সে-কাজ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে শুরু ক'রে দিলেন প্রাইভেট প্র্যাকটিস। তাঁকে ফিরে পেয়ে, তাঁর পূর্বতন রোগীরা ও ছাত্রবৃন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

ডাক্তার হিসেবে, প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই, বিধানচন্দ্রের নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ে। কঠিন কঠিন রোগ সারাবার ফলে, ক্রমশ সে-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার বাইরেও। প্রথমত, তাঁর রোগ নির্ণয় করার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। অনেক সময় ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই, তিনি রোগীর দিকে এক লহমা তাকিয়েই, ব'লে দিতেন রোগীর ঠিক কী অসুখ হয়েছে। তাছাড়া রোগীর কাছে তিনি এমন

একটা হাসি-হাসি মুখ নিয়ে উপস্থিত হতেন যে, সেই বরাভয়-মূর্তি দর্শনে রোগীর অসুখ যেন অর্ধেক ভালো হয়ে যেতো। বাকিটা সেরে যেতো বিধানচন্দ্রের নির্দেশিত ওষুধে আর তাঁর অপরিসীম সহানুভূতিতে। সহানুভূতি, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে 'সিম্‌প্যাথি'। বিধানচন্দ্রের মধ্যে এই মহৎ গুণের ক্ষমতা লক্ষ ক'রে, একদিন এক রোগী তাঁকে অকপটেই নাকি বলেছিলেন—মশাই, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কিংবা অন্য যে-কোনো 'প্যাথি'-ই হোক, আমার বিশ্বাস নেই—আমার বিশ্বাস কেবল 'সিম্‌প্যাথি'-তে।

ডাক্তার হিসেবে বিধানচন্দ্রের জনপ্রিয়তা গোড়ার দিকে কেমন ছিল, সে-সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। এক ভদ্রলোকের স্ত্রী অসুস্থ। তিনি চান একজন ভালো ডাক্তারকে দিয়ে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে। যাঁকেই বলেন, তিনি তাঁর পছন্দসই এক-একজন ডাক্তারের নাম বলেন। ভদ্রলোক পড়লেন মুস্কিলে। কাকে বাদ দিয়ে কাকে ডাকবেন? তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি ভাবলেন, মেডিকেল ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়! তাদের তো আর ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই পেশাদার ডাক্তারদের সম্পর্কে। তারা যা বলবে নিরপেক্ষভাবেই বলবে, ডাক্তারদের পারদর্শিতার কথা চিন্তা ক'রেই বলবে। ভদ্রলোক তখন তাঁর দু'জন নিজের লোককে, কাগজ-পেন্সিল হাতে, পাঠিয়ে দিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে সেরা ডাক্তারদের নামধাম টুকে আনতে। যাঁর নাম অধিকাংশ ছাত্র উল্লেখ করবে, ভদ্রলোক তাঁকেই স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য 'কল্‌' দেবেন। ভদ্রলোক-প্রেরিত লোক দু'জন সকাল ঠিক দশটায় মেডিকেল কলেজের গেটে গিয়ে হাজির হলেন। সেই সময় কলেজ ছুটি হয়, ছাত্ররা গেট দিয়ে বেরিয়ে আসে। লোক দু'জন ছাত্রদের জনে জনে প্রশ্ন করেন—ডাক্তার হিসেবে যাঁর ওপরে আপনার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, তাঁর নাম-ঠিকানাটা দয়া ক'রে লিখে দেবেন কি? এইভাবে প্রায় দু'শ জন ছাত্রকে

জিজ্ঞাসা ক'রে ডাক্তারদের নামধাম লিখে আনলেন তাঁরা। ভদ্রলোক লক্ষ করলেন শতকরা পঁচাশি জন ছাত্রই ডাঃ বি. সি. রয়, এম. ডি. (ক্যাল), এম্. আর. সি. পি. (লণ্ডন), এফ্. আর. সি. এস্. (ইংল্যাণ্ড) এই নামটি লিখে দিয়েছে। শুনে আরও অবাক হলেন যে, এই যে-ডাক্তার বিলেতের দু'-দুটি উচ্চ ডিগ্রীর অধিকারী, তাঁর বয়স নাকি মাত্র উনত্রিশ! ভদ্রলোক মনে মনে খুশী হয়ে বিধানচন্দ্রকেই 'কল্' দিলেন।

রোগী হিসেবে ডাক্তার রায়ের কাছে সকলেই ছিল সমান। তবে, ডাক্তারিতে তাঁর পসার যখন ক্রমশ বাড়তে থাকে, তখন প্রতিযোগিতা-মূলকভাবে শহর-কলকাতায় তাঁর 'ভিজিট' বা 'দর্শনী' উচ্চ হারেই বাড়ে। সকলের পক্ষে অত বেশি টাকা 'ভিজিট' দিয়ে তাঁকে বাড়িতে 'কল্' দেওয়া, কিম্বা তাঁর চেম্বারে গিয়ে রোগী দেখানো সম্ভব হ'তো না। কিন্তু, এই 'ফী'-এর জন্য তাঁর কোনো পীড়াপীড়ি ছিল না। যাঁরা তাঁর নির্ধারিত 'ফী' দিতে পারতেন না—তাঁদের কাছ থেকে তিনি 'ফী' নিতেন না। বাড়িতে একটা 'চ্যারিটি বক্স' রেখেছিলেন। বলতেন—ওই বাক্সে যা সম্ভব দিয়ে যান। সেইভাবে সংগৃহীত সমস্ত টাকাই তিনি সমাজসেবার জন্য ব্যয় করতেন। তাছাড়া, নিজের উপার্জনের বড়ো একটা অংশও তিনি খরচ করতেন দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য।

দুঃস্থ মানুষের প্রতি বিধানচন্দ্রের সহানুভূতি কত যে গভীর ছিল, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন শ্রীসুধীরমাধব বসু। তিনি লিখেছেনঃ "তাঁর একটা বেবী ফোর্ড গাড়ি ছিল, তিনি নিজেই চালাতেন। ডাঃ হরেন মুখার্জি তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। একদিন সকালে গাড়িতে উঠে ডাঃ মুখার্জিকে বললেন, চলো, আজ কাছেই একটা রোগী দেখতে যেতে হবে। ব'লেই গাড়ি স্টার্ট দিয়ে কলেজ স্ট্রীট ও মেছুয়াবাজারের মোড়ে এসে, ডানদিকে মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ধ'রে একটু এগিয়ে, একটা বস্তির সামনে গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে, বস্তির ভেতর ঢুকে ডাঃ মুখার্জিকে আসতে ইশারা করলেন।...ডাঃ রায় একটা

ঘরের সামনে এসে, দাঁড়িয়ে প'ড়ে, ভাঙা দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুললেন। ভেতরে দেখা গেল একটা তক্তাপোষের ওপর মলিন ও শতচ্ছিদ্র শাড়ি গায়ে এক শীর্ণকায়া বৃদ্ধা শুয়ে আছে। ডাঃ রায় তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে বৃদ্ধার হাত ধ'রে নাড়ি পরীক্ষা ক'রেই চেঁচিয়ে ডাঃ মুখার্জিকে বললেন, এ তো মরে গেছে; এর তো আর কেউ নেই, সৎকার আমাদেরই করতে হবে। মুখের কথা শেষ করতে-না-করতেই তিনি বৃদ্ধার জীর্ণ দেহ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসে গাড়ির ডিকির মধ্যে রাখলেন ও গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সোজা নিমতলা শ্মশানঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর কাঠ কিনে, শব দাহ করার ব্যবস্থা ক'রে, যতক্ষণ-না সব শেষ হয় সেখানেই রইলেন। সেই সময় তিনি ডাঃ মুখার্জিকে বলেছিলেন যে, বিলাত যাবার আগে থেকেই তিনি এই বৃদ্ধার চিকিৎসা করতেন, ফিরে এসেও দেখেছেন এবং কয়েক দিন আগে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে আর বাঁচবে না।"

মানবসেবার মহান্ আদর্শ সামনে না থাকলে সত্যিকারের হৃদয়বান্ ডাক্তার হওয়া যায় না। বিধানচন্দ্রের মনে সেই আদর্শ ছিল ব'লেই মানবদরদী চিকিৎসকরূপে উল্লিখিত ঘটনায় তাঁর অন্তরে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল, এবং তিনি তাঁর মৃত অনাথা বৃদ্ধা রোগিণীর সৎকার ক'রে মানবধর্ম পালন করেছিলেন।

নয় মাসের ওপর বিধানচন্দ্রকে কলকাতা পুলিসের কন্‌স্টেবলদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেখাবার কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। তারপর ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে (এখনকার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে) শিক্ষকের পদ পান। 'অ্যানাটমি'-র শিক্ষক।

এখানে আবার ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ইংরেজ ডাক্তারের সঙ্গে প্রাদেশিক মেডিকেল সার্ভিসের বাঙালী ডাক্তারের সংঘর্ষ!

কর্নেল অ্যাণ্ডার্সন চ'লে যাবার পর, ক্যাম্প্‌বেল মেডিকেল স্কুলে

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হয়ে আসেন আই. এম্. এস. কাডারের মেজর রেইট। তাঁর মাসিক বেতন তখন দেড় হাজার টাকা। অথচ, ভদ্রলোক এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ-পরীক্ষায় পাস করতে পারেন নি। নেহাত শ্বেতাঙ্গ ব'লেই আই. এম্. এস. কাডারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কলকাতার এই সরকারি চিকিৎসাবিষয়ক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধান-পদে নিযুক্ত হন। মেজর রেইট যেদিন কাজে যোগ দেন, সেদিনই ডাক্তার রায়কে তাঁর বাড়িতে ডেকে নেন। উদ্দেশ্য, ডাক্তার রায় যে-বিভাগের শিক্ষক সেই বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা। মেজর রেইট প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এখানে কী কী কাজ করেন? ডাক্তার রায় বললেন—অ্যানাটমির ক্লাসে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়। তাছাড়া, ছাত্রদের ডিসেক্‌শনের এবং ডিমনস্ট্রেটরদের কাজকর্মও আমি তত্ত্বাবধান ক'রে থাকি। সে-কথা শুনে মেজর রেইট মন্তব্য ক'রে বসলেন—কাজের অনুপাতে, আমার মনে হচ্ছে, আপনি বেশি বেতনই পাচ্ছেন! বিধানচন্দ্রের আত্মমর্যাদায় ঘা দিলেন রেইট-সাহেব। চাকরি করছেন ব'লে, ওই ধরনের অসঙ্গত ও অশোভন কোনো মন্তব্য হজম ক'রে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না বিধানচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন। বললেন—দেখুন, একজন এম্. আর. সি. পি. (লণ্ডন), এফ্. আর. সি. এস্. (ইংল্যাণ্ড) এবং এম্. ডি. (ক্যালকাটা) হয়েও বেতনাদি বাবদ মাসে পাচ্ছেন মাত্র ৩৩০ টাকা। অথচ, আর-একজন (মেজর রেইটকে ইঙ্গিত ক'রেই) এডিনবার্গ-ফেলোশিপ পরীক্ষায় ফেল ক'রেও মাসে পাবেন দেড় হাজার টাকা!! এ-ধরনের অসমতার কারণ যে কী, তা আমি জানি না। খুব সম্ভব, বর্ণবৈষম্যই এর একমাত্র কারণ। একজন ভারতীয় তরুণ ডাক্তারের কাছ থেকে এমন কড়া জবাব শুনবেন ব'লে মেজর রেইট আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। ডাক্তার রায়ের নজরে পড়লো, সাহেবের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে প্রত্যাঘাতের জ্বালা। সাহেবের গায়ের রঙ একেই লাল, এবারে তা আরও লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু মুখে আর কোনো কথা

জোগালো না তাঁর। পরে অবশ্য ডাক্তার রায়কে অন্যভাবে নাজেহাল করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এঁটে উঠতে পারেন নি।

আর একটি ঘটনা। এও সেই ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের চত্বরে। লর্ড কার্জনের দ্বিধাবিভক্ত বাংলার শেষ লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নর স্যর অ্যানড্রু ফ্রেজার আসছেন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল দেখতে। তাঁর আসবার খানিক আগে, ডাক্তার রায় তাঁর নিজের গাড়িতে ক'রে হাসপাতালের সদর ফটকে এসে পৌঁছুলেন। লাটসাহেবকে স্বাগত-অভ্যর্থনার জন্য সেখানে তখন তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা অপেক্ষা করছিলেন। ডাক্তার রায় গাড়ি থেকে নেমেই তাঁদের ভিড়ে মিশে গেলেন। মেজর রেইট যে কাছাকাছি কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেটা তিনি লক্ষ্য করেন নি। লাটসাহেব স্কুল ও হাসপাতাল পরিদর্শন ক'রে চ'লে যাবার পর, মেজর রেইট ডেকে পাঠালেন ডাক্তার রায়কে। তিনি এলে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ডাক্তার রায় তাঁকে দেখতে পেয়েও, কেন মাথা থেকে 'হ্যাট' উঠিয়ে তাঁকে সম্মান দেখান নি। সে-প্রশ্নের জবাবে বিধান বললেন: 'আমি প্রকৃতপক্ষে আপনাকে দেখতেই পাই নি। আর, দেখতে পেলেও মাথা থেকে হ্যাট ওঠাতাম না। মুখে গুড্‌মর্নিং ব'লেই সম্মান দেখাতাম। কেননা, ইংল্যাণ্ডেও দেখেছি, সুপারিন্‌-টেণ্ডেন্ট বা অধ্যাপককে দেখে হ্যাট তুলতে হয় না, মুখে কেবল গুড্-মর্নিং, গুডআফ্‌টারনুন ইত্যাদি বললেই চলে।' বিধান আরও বললেন—'আমি মনে করেছিলাম, ইংরেজরা যেখানেই যান, তাঁদের আচারবিধি সেখানেও চালু থাকে।' মেজর রেইট ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'সে হ'লো ইংল্যাণ্ডের ব্যাপার, আর এটা হ'লো ইণ্ডিয়া!' খোঁচা খেয়ে ডাক্তার রায় গম্ভীর হয়ে ব'লে উঠলেন, 'বেশ, আপনি তাহ'লে এবারে একটা নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেবেন যে, প্রত্যেকেরই মাথার টুপি তুলে সম্মান দেখানো উচিত।'

মেজর রেইট সে-ধরনের কোনো নোটিশ অবশ্য জারি করেন নি।

কেননা, তাতে যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে, সেটা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে, সেদিন থেকে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে মাথার টুপি খুলে উর্ধ্বতন কাউকে সম্মান দেখাবার রীতিটাই একেবারে উঠে গেল।

ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে ইংরেজ সাহেবদের প্রচলিত আরও একটি অবাঞ্ছিত রীতি লোপ পায় ডাক্তার বিধান-চন্দ্রের সৎসাহসের জন্য। সে-রীতিটা ছিল স্কুল বা হাসপাতাল চত্বরে কোনো অধ্যাপক বা শিক্ষককে দেখামাত্র ছাত্রদের মাথায়-দেওয়া ছাতা বন্ধ করতে হবে। ডাক্তার রায়ের কাছে ওই রীতি স্বভাবত সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অযৌক্তিক ব'লে মনে হ'তো। কোনো ছাত্র হয়তো ক্লাসে বা ওয়ার্ডে ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এমন সময় সেই পথে পর পর তিনজন অধ্যাপক বা শিক্ষককে দেখা গেল,—তাহ'লে সেই ছাত্রকে প্রচলিত রীতি অনুসারে পর পর তিনবারই ছাতা খুলে তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাতে হ'তো। ডাক্তার রায়ের বিবেচনায় সেই রীতি শুধু যে ছাত্রদের কাছে বিরক্তিকর ছিল তা নয়, সে-রীতি ছাত্রদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্যাদার দিক থেকেও হানিকর ছিল। তিনি একদিন ছাত্রদের ওইভাবে সম্মান দেখাতে সোজা নিষেধ ক'রে দিলেন। বললেন—মুখে শুধু সম্মান-প্রদর্শনসূচক গুড্-মর্নিং, গুড্আফ্টারনুন, গুড্ইভ্নিং ইত্যাদি ব'লো, বা নমস্কার জানিয়ো, তাতেই সম্মান দেখানো হবে।

ছাত্রমহলে ডাঃ বি. সি. রায়ের তখন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা। কাজেই তাঁর সেই উপদেশবাণী মুখে মুখে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। ছাত্ররা সেদিন থেকে তাঁর সেই উপদেশ মেনে চলতে লাগলো। একদিন মেজর রেইট লক্ষ্য করলেন, তাঁকে দেখেও কয়েকজন ছাত্র মাথার খোলা ছাতা না গুটিয়ে মুখে শুধু বললে—'গুড্মর্নিং স্যর!' বলা বাহুল্য, মেজর রেইট মনে মনে চটে গেলেন। সেই ছাত্ররা, রীতি অনুসারে, খোলা ছাতা কেন বন্ধ করলো না, সে-কথা জিজ্ঞাসা করলেন

তাদের। ছাত্ররা বললে, ডাক্তার রায় তাদের ওইভাবেই মুখের শ্রদ্ধা-সম্ভাষণে সম্মান জানাবার উপদেশ দিয়েছেন।

ডাক পড়লো 'অ্যানাটমি'-র শিক্ষক ডাঃ বি. সি. রায়ের, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মেজর রেইটের অফিসকক্ষে। সেই ঘটনার উল্লেখ ক'রে রেইট-সাহেব জানতে চাইলেন, ডাক্তার রায় কেন ছাত্রদের অবাধ্যতা ও শৃঙ্খলাহীনতা শেখাচ্ছেন। বিধানচন্দ্রের জবাব খুবই স্পষ্ট। তিনি বললেন: 'ছাত্রদের আমি কখনো অবাধ্য বা শৃঙ্খলাহীন হ'তে শিক্ষা দিতে পারি না। আমি শুধু বিরক্তিকর ও অযৌক্তিক একটা রীতির বদলে যুক্তিসঙ্গত শোভন রীতিতে ওদের সম্মান দেখাতে বলেছি।'

মেজর রেইট এর আগেই বারকয়েক টের পেয়েছিলেন যে, বাঙালী এই ডাক্তারটি কী ধাতুতে গড়া। কাজেই, তিনি আর এ নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করলেন না। ফলে, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে প্রচলিত বহুবছরের পুরনো একটা অবাঞ্ছিত রীতি জাতীয়-মর্যাদাবোধসম্পন্ন ডাক্তার বিধানচন্দ্রের হস্তক্ষেপে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ডাক্তার রায় শিক্ষকতা করেছেন ১৯১৯ সাল পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ একদিন সেই সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। একদিন স্কুলের কাজ সেরে, তিনি বৌবাজার স্ট্রীট (এখনকার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) ধ'রে তাঁর গাড়িতে ক'রে বাসায় আসছিলেন। বৌবাজার-কলেজ স্ট্রীট জংশনের কাছাকাছি আসতে, তাঁর নজরে পড়লো বিপরীত দিক থেকে আসছেন ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র। ডাক্তার মিত্র হাত তুলে তাঁকে গাড়ি থামাতে বললেন। তারপর কথা হ'লো দু'জনের। সে-সময় বে-সরকারি জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ'ড়ে উঠেছে 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ', কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তখনও তার স্বীকৃতি ('অ্যাফিলিয়েশন')

পাওয়া যায় নি। ডাঃ মিত্র বললেন, 'আজই কয়েক ঘণ্টা বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মীটিং। সেই সভায় 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'কে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে।' সিণ্ডিকেট ওই কলেজের 'প্রফেসর-অব্-মেডিসিন'-পদে নিয়োগের ব্যাপারে একটা আপত্তি তুলেছেন। অর্থাৎ, যাঁকে নিয়োগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাঁকে সিণ্ডিকেটের পছন্দ নয়। তবে, ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে যদি কলেজ-কর্তৃপক্ষ ওই পদে নিযুক্ত করেন, তাহ'লে সিণ্ডিকেট কলেজের 'অ্যাফিলিয়েশন' দিতে আর কোনো আপত্তি তুলবেন না। ডাক্তার মিত্র ডাক্তার রায়কে অনুরোধ করলেন 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'-এর 'প্রফেসর-অব-মেডিসিন'-পদে যোগ দেবার জন্য।

এক মুহূর্ত কী চিন্তা করলেন বিধানচন্দ্র। সম্মতি জানালেন 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রকে। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা আবার ফিরে গেলেন ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে। সেখানে তখন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট—কর্নেল লেভেন্টন। ডাক্তার রায় একটি পদত্যাগ-পত্র লিখে তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

এই ঘটনার ঘণ্টাখানেক বাদেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট যখন জানতে পারলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'-এর অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হ'তে সম্মত হয়েছেন, তখন তাঁরা কলেজের স্বীকৃতি-বিষয়ক প্রস্তাবটিও মঞ্জুর করলেন। সেই থেকে সুদীর্ঘকাল বিধানচন্দ্র ছিলেন সেই মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। অধ্যাপক হিসেবে অবসরগ্রহণ ক'রেও, সেই কলেজের সঙ্গে তিনি তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। কেননা, তাঁর উদ্যোগে ও সক্রিয় সহায়তায় এদেশে যে-সব কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ছিল তাদের মধ্যে প্রথম।

গোড়ার দিকে 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ' ছিল বৌবাজার স্ট্রীটে। তখন সেটা ছিল স্কুল। নাম ছিল—'অ্যালবার্ট ভিক্টর স্কুল

অব্ মেডিসিন'। সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এবং আরও কয়েকজন। পরে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী, নীলরতন সরকার, আর্. এল্. দত্ত, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, কেদারনাথ দাস, এম্. এন্. ব্যানার্জী, ললিতমোহন ব্যানার্জী, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং আরও অনেক ডাক্তার ও সার্জন-এর সক্রিয় উদ্যোগ, সহায়তা ও সহযোগিতায় গ'ড়ে ওঠে যে-কলেজ, তার নাম রাখা হয় 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'। পরে বিস্তৃত আকারে উত্তর-কলকাতার বেলগাছিয়ায় সেই কলেজ ও তার সংলগ্ন হাসপাতাল স্থানান্তরিত হয়। সে-যুগে ভারতবর্ষে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের বৃহত্তম মহাবিদ্যালয় ছিল সেই 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'। সেখানে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্ররা এসে ভিড় করতো ডাক্তারি পড়বার জন্য। পরবর্তীকালে সেই কলেজের পুরোধা-প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর-এর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, কলেজের নাম পরিবর্তিত ক'রে রাখা হয়—'আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ'।

এই কলেজ ও হাসপাতালের উন্নতি ও প্রসারের জন্য ডাক্তার রায় গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের বহু দেশীয় রাজা-মহারাজা ও জমিদারদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দান হিসাবে সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে ডাঃ বি. সি. রায়ের সুনাম তখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। চিকিৎসার খাতিরে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু ক'রে দেশীয় রাজা-মহারাজারা, জমিদাররা, এমন কি নেপালের রাজপরিবার ও মন্ত্রীরা সকলেই বিধানচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। কাজেই, ডাক্তার রায়ের মুখের কথাতেই কাজ হয়ে যায়।

চিকিৎসা-বিদ্যার শিক্ষক তথা অধ্যাপক-রূপে কাজ করতে করতেই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিধানচন্দ্রের একটা আগ্রহ দেখা যায়।

এ-ব্যাপারে তাঁর অনেক আলোচনাও হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য তথা বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার রূপকার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। গুণগ্রাহী আশুতোষ বিধানচন্দ্রকে কলকাতা বিশ্বহিদ্যালয়ের 'ফেলো'-রূপে, কর্মপরিচালনা-সমিতির, অর্থাৎ সেনেটের, অন্যতম সদস্যরূপে পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে, ১৯১৬ সালে, ডাক্তার রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সদস্য হন। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটেরও সদস্য হন এবং 'বোর্ড অব্ অ্যাকাউন্ট্‌স্'-এর সভাপতিরূপে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক উন্নতি-বিধান ও পরিচালন-স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে বিধানচন্দ্র সচেষ্ট ও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এই পরিচালন-স্বাধীনতার ব্যাপারে সে-সময় ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মনকষাকষি চলছিল, তা দূর ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় যাতে ন্যায়সঙ্গত স্বাধিকার লাভ করতে পারে, এবং দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য পায়, সেজন্য বিধানচন্দ্র সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিদেশী সরকারের স্তাবক কোনো বাঙালী সদস্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে 'অপরাধযোগ্য চিন্তাহীনতা'-র দায়ে অভি-যোগ তুললে বিধানচন্দ্র বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। স্যর আশুতোষ এবং সেনেটের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বিধানচন্দ্র বলেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কোনো সদস্য না থাকায় যে যা পারে তাই ব'লে যাচ্ছে, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সেই ঘটনাই প্রকারান্তরে তাঁকে ঠেলে দিল রাজনীতির ক্ষেত্রে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে বিধানচন্দ্রের প্রবেশ যেমন আকস্মিক, তেমনি চমকপ্রদ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য তাঁকে

আশুতোষই অনুরোধ করেন। নির্বাচনে দাঁড়ালেন বিধানচন্দ্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন। তাও আবার কার বিরুদ্ধে, না 'জাতীয়তা-বাদের জনক,' সে-যুগের ডাকসাইটে রাজনীতিক, অসাধারণ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। যে-কেন্দ্র থেকে নির্বাচন, সেই 'ব্যারাকপুর নির্বাচনক্ষেত্র' থেকে সুরেন্দ্রনাথ এর আগেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাজেই, বলা যেতে পারে যে, রাজনীতিক্ষেত্রে 'প্রবল প্রতাপান্বিত' এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 'সম্পূর্ণ নবাগত' এক ব্যক্তির ভোটযুদ্ধ! প্রায় সকলেই নিশ্চিত ছিলেন যে, বিধানচন্দ্রের পরাজয় অনিবার্য। কেউ কেউ মন্তব্যও করেছিলেন যে, 'ব্যারাকপুর নির্বাচন-ক্ষেত্র' বেছে নেওয়াটাই ডাক্তার রায়ের পক্ষে ভুল হয়েছে। ডাক্তার রায় নিজেও যে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ছিলেন তা নয়। কিন্তু মনকে তিনি এই ব'লে প্রবোধ দিয়েছিলেন যে, এতে আর চিন্তার কী আছে; যদি হেরে যাই, তা হ'লে তো একজন প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছেই হারবো; আর, তাঁকে যদি হারিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে সে জয়-লাভের কি আর কোনো তুলনা থাকবে! না, বাংলার নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সেই ধরনের জয়লাভ আজও তুলনাহীন। সকলকে চরম বিস্ময়ে অবাক্ ক'রে দিয়ে, বিধানচন্দ্র সে-বার নির্দল প্রার্থীরূপে ৩,৪০৫ ভোটের ব্যবধানে সুরেন্দ্রনাথকে হারিয়ে দিয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। যদিও দেশবন্ধু তখন 'স্বরাজ্য দল'-এর নেতা, তবু সেই দলের প্রার্থীরূপে ডাক্তার রায় নির্বাচনে দাঁড়ান নি। অবশ্য, নির্দলীয় প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও, দেশবন্ধুর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল তাঁরই দিকে। কয়েকটি নির্বাচনী সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিধানচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন ক'রে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসে (স্বরাজ্য দলে) আনুষ্ঠানিকভাবে বিধানচন্দ্র তখনও যোগ দেন নি। তবে সেই রাজনীতিক দলকেই তিনি দেশবাসীর

আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনে করতেন। তাই লক্ষ্য করা গেছে, ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশের দিন থেকেই বিধানচন্দ্র স্বরাজ্য-দলের নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গেই বসছেন এবং স্বরাজ্য-দল সদস্যদের উত্থাপিত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিচ্ছেন। ১৯২৮ সালের কোনো সময়ে তিনি অবশ্য কংগ্রেস-দলে যোগ দেন। আর, তার কিছুকাল পরেই মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্যে এসে, কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার তৎকালীন সদস্য হিসাবে ডাক্তার রায় তাঁর নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য যেমন কাজ করেছেন, তেমনি করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা প্রদেশের শিক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য। ১৯২৫ সালে ব্যবস্থাপক-সভায় তিনি সে-বছরের 'পরিপূরক-বাজেট' এবং পরবর্তী প্রতি বছরের বাজেটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার পৌনঃপুনিক ঘাটতি পূরণের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ক'রে অনুদান অন্তর্ভুক্ত করবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সে-সময় তিনি তাঁর প্রস্তাবের সারবত্তা প্রমাণের জন্য যে-বক্তৃতা দেন তা ছিল অসাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সরকার যে বারবার নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেন নি, এবং শপথ-ভঙ্গের অভিযোগে অপরাধী, ডাক্তার রায়ের ভাষণে তা ঐতিহাসিক প্রমাণাদির ভিত্তিতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটকে যে সরকারের উচ্চপদস্থ আমলাদের ক্রমাগত চেষ্টায় সরকারী পক্ষপুটে নিয়ে যাবার উদ্যোগ চলেছে, সম্প্রদায়গত বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং শিক্ষাবিদে শিক্ষাবিদে ঝগড়া লাগিয়ে দেবার কাজ শুরু হয়েছে, এমন অভিযোগও তিনি করেন প্রমাণাদির সাহায্যে। ১৯২৫ সালে যখন ব্যবস্থাপক-সভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল' উত্থাপিত হয়, তার আলোচনাতেও ডাক্তার রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ভাষণ হ'তো সব সময়েই গঠনমূলক এবং যুক্তিনির্ভর।

শিক্ষার সমস্যাদি নিয়ে বিধানচন্দ্র ব্যবস্থাপক-সভায় যেমন

লড়েছেন, তেমনি জনস্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসাদির সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য সরকারি ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের বাস্তবসম্মত পরামর্শ দিয়েছেন। সেকালে সরকারি মেডিকেল স্কুলের সঙ্গে বেসরকারি মেডিকেল স্কুলকে আলাদা ক'রে দেখবার একটা যে ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ছিল, তারও প্রতিবাদ তিনি করেছেন। তাছাড়া, 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস'-এর সদস্যদের প্রতি অহেতুক সরকারি পক্ষপাতিত্বের নিন্দাও করেছেন বার বার। বর্তমান কালে 'পরিবেশ-দূষণ' বিষয়ে সকলেই চিন্তিত এবং পৃথিবী জুড়ে এ নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনেকেই অনেক কিছু ভাবছেন এবং ব্যবস্থা নিচ্ছেন। দূরদর্শী ডাক্তার বিধানচন্দ্রের মনে পরিবেশ দূষণের ফলে জনস্বাস্থ্যের যে বিরাট ক্ষতি হবে—এই চিন্তা এসেছিল সেই অর্ধশতাব্দী কাল আগেই। ১৯২৫ সালে ব্যবস্থাপক-সভায় তিনি এই মর্মে একটি প্রস্তাব এনেছিলেন যে, হুগলি নদীর জল কী কী কারণে দূষিত হচ্ছে তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতে এই দূষণ প্রতিরোধের জন্য আইনানুগ অথবা অন্য প্রকার ব্যবস্থা-গ্রহণের সুপারিশ করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক। এই প্রস্তাবের পক্ষে তিনি সেদিন যে-ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, পরিবেশ-দূষণ সম্পর্কিত জটিল বিষয়ে তাঁর চিন্তার গভীরতা ছিল কী অপরিসীম।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হিসেবে ডাক্তার রায় যে কখনো বাগ্মিতানৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাগ্মী ছিলেন না। কিন্তু 'ডিবেট' করতে বা তর্কের জাল বুনতে পারতেন ভালো। তাঁর কথা বলার মধ্যে একদিকে যেমন থাকতো অকাট্য সব যুক্তি এবং তথ্য-প্রমাণাদির মাল-মসলা, অন্যদিকে তেমনি থাকতো বিরোধী বক্তাদের বক্তৃতার প্রতি শ্লেষ বা বিদ্রূপ-কৌতুক। তবে কাউকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিন্দাসূচক আক্রমণ করতেন না; তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হ'তো প্রতিপক্ষের বক্তব্যের ভুলভ্রান্তি বা অসারতা। সরস চতুর প্রত্যুত্তর দেবার যে নিপুণতা তিনি সে-সময়

আয়ত্ত করেছিলেন, তা তাঁর পরবর্তী জীবনেও অটুট ছিল।

সেকালের ব্যবস্থাপক-সভায় ডাক্তার বিধানচন্দ্রের বক্তৃতায় কী ধরনের বিদ্রূপ-কৌতুক থাকতো, এই প্রসঙ্গে তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। তদানীন্তন ইংরেজ-সরকারের সমর্থক-সদস্যদের তিনি তিন শ্রেণীতে ভাগ ক'রে তিনটি চমকপ্রদ ও শ্লেষাত্মক নাম দিয়েছিলেন। যথা—(১) ল্যাটিচ্যুডিনারিয়ান্‌স (Latitudinarians) —অর্থাৎ, গভর্নমেণ্ট ব্লকের যে-সব সদস্য প্রভূত সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতার অধিকারী, জনসাধারণের স্বাধীনতা নিয়ে যাঁরা ছিনিমিনি খেলেন এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষায় যাঁরা অর্থকরী সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে থাকেন; (২) অ্যাটিচ্যুডিনারিয়ান্‌স (Attitudinarians) —অর্থাৎ, দেখতে শান্তশিষ্ট এমন সব সদস্য যাঁরা 'ট্রেজারী বেঞ্চের' ভাবভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং প্রভুদের ভাবে বিভাবিত হয়ে নিজেদের ইচ্ছাকে পরিচালিত করেন; যাকে বলে, নির্লজ্জ স্তাবকতায় যাঁরা সুদক্ষ; যাঁরা হলেন আধুনিক রাজনীতি জীবনের প্রকৃত জয়চাঁদ-উমিচাঁদ; আর (৩) প্ল্যাটিচ্যুডিনারিয়ান্‌স (Platitudinarians) —অর্থাৎ, মামুলী ধরনের কর্তাভজার দল, যাঁরা যা ভাবেন না তাই বলেন এবং যা ভাবেন তা বলেন না !!

দেশবন্ধুর মৃত্যুর দু' বছর পর, ১৯২৭ সালে বিধানচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় কংগ্রেস-দলের সহকারী-নেতা নির্বাচিত হন। তখন নেতা ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। একটানা সাত বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য ছিলেন ডাক্তার রায়। সদস্যরূপে পর পর তিনবার তিনি নির্বাচিত হন।

৪

১৯২৮ সাল। সে-বছর ডাক্তার রায় কংগ্রেস-দলের সদস্য হয়েছেন। আর, সেই বছরেই পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কলকাতায় বসেছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। সেই ঐতিহাসিক অধিবেশনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দুই উত্তরসাধকের ওপর। তাঁদের একজন হলেন বিধানচন্দ্র অন্যজন সুভাষচন্দ্র। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আর সাধারণ সম্পাদক বিধানচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সে-বার অভ্যর্থনা-সমিতির সাধারণ-সম্পাদকরূপে প্রশংসনীয় সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন ডাক্তার রায়। তাঁর কর্মনিপুণতায় ও কর্মতৎপরতায় অধিবেশন-এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, দিবারাত্র পরিশ্রুত জল-সরবরাহ, প্রতিনিধিদের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতের যাবতীয় ব্যবস্থাই হয়েছিল যথাসম্ভব নিখুঁত ও সুন্দর।

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে বিধানচন্দ্র কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৮-২৯ সাল থেকেই মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু এবং আরও অন্যান্য জাতীয় নেতার সঙ্গে বিধানচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। এই সব নেতাদের অনেকেই ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্রের চিকিৎসাধীন।

১৯৩০ সাল থেকে দেশসেবার বৃহত্তর কাজের সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত করেন ডাক্তার রায়। আর, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর অপূর্ব

সংগঠন-শক্তি, কর্মকুশলতা ও দেশপ্রীতির পরিচয় দেন। ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি (প্রকৃতপক্ষে ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে) লাহোরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-অধিবেশনে গৃহীত হয় 'পূর্ণ স্বাধীনতা' অর্জনের ঐতিহাসিক প্রস্তাব। তারপর দেখা দেয় মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত 'লবণ-সত্যাগ্রহের' মাধ্যমে দেশ জুড়ে 'আইন-অমান্য আন্দোলন'। সেই আন্দোলনের কর্মনির্দেশ অনুসারে অন্যান্যদের সঙ্গে বিধানচন্দ্রও ব্যবস্থাপক-সভা থেকে পদত্যাগ করেন। এই সময় কংগ্রেস-দলকে বেআইনী ব'লে ঘোষণা করেছিলেন ব্রিটিশ-সরকার।

দেশব্যাপী 'আইন-অমান্য আন্দোলন'-এর সূত্রে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত তখন কারারুদ্ধ। তাঁর সঙ্গে বাংলার আরও অনেক কংগ্রেস-কর্মী ও নেতাকে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া, সেই আন্দোলনের আগেই এক 'রাজদ্রোহের মামলায়' অভিযুক্ত ক'রে সুভাষচন্দ্র বসুকে বন্দী ক'রে রেখেছেন প্রাদেশিক সরকার। কাজেই, বাংলায় সেই ঐতিহাসিক 'আইন-অমান্য আন্দোলন' পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়লো বিধানচন্দ্রের ওপর। মার্চ মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত, প্রায় ছ' মাস ধ'রে, বিধানচন্দ্র সেই দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। সেই আন্দোলনের সূত্রপাত থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের জনমানসে এবারে বিরাট জাগরণের পালা এসেছে, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকবর্গও তৈরী হয়েছেন তাঁদের দমননীতির সর্বপ্রকার অস্ত্র নিয়ে।

সেই ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসেই বিধানচন্দ্র যে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সদস্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তখন কংগ্রেস সভাপতি, কিন্তু মীরাট জেলে কারারুদ্ধ। আর, নৈনি সেন্ট্রাল জেলে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন পণ্ডিত মতিলাল। কলকাতায় ডাক্তার রায়ের কাছে খবর

গেল যে, মতিলালের কাশিতে রক্ত উঠছে—অবিলম্বে বিধানচন্দ্রের একবার এলাহাবাদে চ'লে আসা দরকার। খবর পেয়েই মতিলালকে পরীক্ষা করবার জন্য কলকাতা থেকে এলাহাবাদে ছুটে গেলেন বিধানচন্দ্র। সেখানে কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার এম্. এ. আন্সারী ইতিমধ্যে এসে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা দু'জনে তখন নৈনি সেণ্ট্রাল জেলে গিয়ে পণ্ডিত মতিলালকে দেখে এলেন। তারপর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়ে দিলেন উত্তর-প্রদেশের (তখনকার ইউ. পি. বা সংযুক্ত প্রদেশ) সরকারের কাছে, লক্ষ্ণৌতে। সরকারের কাছ থেকে কী জবাব আসে তা দেখবার জন্য ডাক্তার রায় রয়ে গেলেন এলাহাবাদে, কিন্তু সেইদিনই দিল্লীতে ফিরে গেলেন ডাক্তার আন্সারী। তিনি তখন মৌলানা আজাদের অনুপস্থিতিতে কংগ্রেস-সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

সেটা একটা রবিবার। বিধানচন্দ্র সেদিন লক্ষ্ণৌ থেকে খবর পেলেন যে, পরদিন সরকারী ডাক্তারেরা এসে পণ্ডিত মতিলালের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন নৈনি সেণ্ট্রাল জেলে। কাজেই, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এলাহাবাদে থাকাই যুক্তিসঙ্গত হবে ভেবে বিধান সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে মঙ্গলবার দিল্লীতে ডাক্তার আন্সারীর বাড়িতে আহূত হয়েছে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির এক সভা। বিধানচন্দ্রকে সেই সভাতেও উপস্থিত থাকতে হবে। কাজেই, সমস্যা দেখা দিল। যাই হোক, দিল্লীতে ফিরে গিয়ে, ডাক্তার আন্সারী ফোনে খবর দিলেন যে, দিল্লীতে মঙ্গলবার ওআর্কিং কমিটির যে-সভা বসবে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কাজেই, এলাহাবাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে ডাক্তার রায় কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন। সে-কথা শুনে ডাক্তার রায় স্থির করলেন, সোমবার সন্ধ্যায় এলাহাবাদ থেকে কলকাতার ট্রেন ধরবেন। কিন্তু সোমবার সকালবেলায় প্রভাতী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নজর পড়তেই দেখলেন এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি,—কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি বেআইনী ব'লে ঘোষিত। সঙ্গে

সঙ্গে মত বদলালেন ডাক্তার রায়। সোমবার দিনের গাড়িতেই তিনি এলাহাবাদ থেকে দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

পরদিন ২৬ আগস্ট ; মঙ্গলবার।

সেদিন দিল্লীতে গ্রেপ্তার হলেন ওআর্কিং কমিটির সদস্য ডাক্তার বি.সি.রায় ; সেই সঙ্গে ডাক্তার এম্.এ. আন্সারী, বিঠলভাই প্যাটেল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, দীপনারায়ণ সিংহ এবং আরও অনেকে। তু'দিন বাদেই, ২৮ আগস্ট বেলা এগারোটার সময় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সবাইকে হাজির করা হ'লো বিচারের জন্য। দিল্লী জেলের ইউরোপীয় ওআর্ডের মাঠে তাঁবু খাটানো হয়েছিল। কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে, বিচারের বাণী ঘোষিত না-হওয়া পর্যন্ত, তাঁদের রাখা হয়েছিল সেইখানেই। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁদের হাজির করা হ'লে, সেই ইংরেজ-ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাদের যদি কিছু বলবার থাকে তো বলুন—তখন কেউই কোনো জবাব দিলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট বুঝলেন, তাঁরা কোনো জবাবই দেবেন না, তাঁদের নীরবতাই যেন তাঁদের সেই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। তিনি তখন তাঁর খাসকামরায় ফিরে গেলেন। আর, কংগ্রেসের সেই নেতাদের ফিরিয়ে আনা হ'লো দিল্লী জেলের সেই তাঁবুতে। কিন্তু, ঘণ্টাখানেক বাদে, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের সঙ্গে নিয়ে, সেই তাঁবুতেই আবির্ভূত হলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। বিচারের বাণী ঘোষণা করলেন : "ভদ্রমহোদয়গণ, আমি তুঃখিত, আপনাদের সবাইকে আমি 'ক'-শ্রেণীর বন্দী হিসাবে ছ'মাসের সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।"

রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে, ডাক্তার বিধানচন্দ্র শুরু করলেন তাঁর সেই কারাজীবন। সেই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই এক জায়গায় বলেছেন : "সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দিল্লী জেলের অভ্যন্তরে আছি বটে,

কিন্তু জেল-জীবনের সেই কঠোরতা কই? তাঁবুর মধ্যে সবাই মিলে, বেশ হৈ হৈ ক'রে, দশটা দিন দিব্যি কাটিয়ে দিলাম। তখন মনে হয়েছিল, আমরা যেন একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়ে, তাঁবুতে রয়েছি, খাচ্ছিদাচ্ছি, বই পড়ছি, জেলখানার ভিতরের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

দশদিন বাদে, পুলিসের লোকেরা এসে, বিধানচন্দ্র ও দীপনারায়ণ সিংহকে, দিল্লী জেলের ফটকের বাইরে এনে, একটা মোটরগাড়িতে ওঠালেন। গাড়ির চালকের আসনে ব'সে দিল্লীর ইংরেজ পুলিস-সুপারিনটেণ্ডেন্ট গাড়ি দিলেন ছেড়ে। বন্দী-আরোহী দু'জন তখনও জানতেন না, তাঁদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ-পথ, সে-পথ, এমন কি গলি-পথ ও নানা ঘুরপথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে, পুলিস-সুপার শেষপর্যন্ত তাঁদের রেলস্টেশনে নিয়ে গিয়ে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় তুলে দিলেন্। সঙ্গে অবশ্য পুলিস-প্রহরী রইলো। বিধানচন্দ্র জানতে পারলেন, তাঁকে এবার কলকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।

হাজারিবাগ রোড স্টেশনে গাড়ি থামলো।

সেখানে এসে হাজির হ'লো বিহার-পুলিসের অফিসারেরা। তাঁরা এসে দীপনারায়ণ সিংহকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন হাজারি-বাগ সেণ্ট্রাল জেলে আটক ক'রে রাখবার জন্য।

পুলিস-প্রহরায় বিধানচন্দ্র এবারে চললেন কলকাতা অভিমুখে। বর্ধমান স্টেশনে গাড়ি থামতেই, জানালা দিয়ে তিনি প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য, প্ল্যাটফর্মে তাঁর ছোড়দা সাধনচন্দ্র দাঁড়িয়ে! পুলিস-অফিসারের অনুমতি পেয়ে, ছোড়দা এসে তাঁর কামরায় উঠলেন। দু'ভাইয়ের মধ্যে তখন কুশলপ্রশ্নাদির বিনিময় হ'লো। তারপর, সোজা একেবারে হাওড়া স্টেশন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হয়েছেন অগণিত বন্ধুবান্ধব এবং সাধারণ মানুষ। অজস্র ফুলের মালা ও ফুলের তোড়ায় অভিনন্দিত হয়ে অভিভূত হয়ে

পড়লেন বাংলার কংগ্রেস-নেতা, তথা নিখিল ভারত কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সদস্য, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

স্টেশন থেকে সোজা আলিপুর সেন্ট্রাল জেল।

কারাবাস করতে এসে, দীর্ঘকায় সেই পুরুষকে এই প্রথমবার কেমন যেন একটু বিব্রত মনে হ'লো। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের প্রথম ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার রায় ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। যাঁর জীবনের আদর্শ 'কখনো মাথা হেঁট করব না' তাঁকেই কিনা আজ ওই ছোটো ও নিচু ফটকের মধ্য দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে কারাগারে প্রবেশ করতে হবে! কিন্তু উপায় নেই। তাই করতে হ'লো। সেই প্রথম গেট পার হয়ে তাঁকে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হ'লো। জেলের নিয়মকানুন অনুযায়ী সইসাবুদ করবার জন্য। তারপর আবার আর একটা নিচু লোহার দরজা, আগেকার মতো মাথা হেঁট ক'রে, যখন পার হলেন, তখন থেকে শুরু হলো তাঁর লৌহকপাটের অন্তরালে কাটাবার জীবন।

সেই কারাজীবন প্রসঙ্গে ডাক্তার রায়ের নিজস্ব উক্তি : 'এ-কথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই যে, আমার সেই কারাজীবন আমার ক্ষেত্রে ওঁরা যথাসম্ভব আরামপ্রদ করার ব্যবস্থা করলেও, বন্দীর স্বাধীনতা সম্পর্কিত সকল বিধিনিষেধই সেখানে বজায় ছিল। সে-সব কথা এখনও বিশেষভাবে মনে জাগে। সেলের নিরেট দেওয়াল-গুলি বারো ফুট ক'রে উঁচু। চার দেওয়ালের এক কোণে একটি লোহার দরজা। আর, একটি দেওয়ালের বেশ উঁচুতে একটি মাত্র জানালা। রাত্রে ওই জানালাটাই যেন আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলতো। সেলের বাইরে ছিল ছ'ফুট চওড়া একটা বারান্দা। কিছুটা

স্বাধীনতা পাওয়া যেতো সেই বারান্দায়। কিন্তু, গোটা ব্লকটার চারদিকেই উঁচু উঁচু দেওয়াল। পিছনের ব্লকে যাবার যে-গেট, সে-গেটও দিনরাত তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করা থাকতো।"

সেলে যতক্ষণ থাকতে হতো, মনের দিক থেকে সেই কয়েক ঘণ্টা নিঃসন্দেহে ছিল পীড়াদায়ক। কিন্তু, ডাক্তার রায়ের কাছে মনে হ'তো সেই কয়েক ঘণ্টা যেন এক আরোপিত বিশ্রামের অবকাশ। তবে, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু বিরক্তি লাগতো বৈকি!

রাজনীতিক বন্দী বিধানচন্দ্র রায় যে একজন উচ্চ ডিগ্রীধারী সুচিকিৎসক সে-কথা জানতেন কারাধ্যক্ষ মেজর পাটনী। কেননা, তিনিও একজন চিকিৎসক। কাজেই, একটা কাজের ভার জুটে গেল ডাক্তার রায়ের। জেলের ভিতরে যে ১২০-শয্যার একটি হাসপাতাল ছিল, সেই হাসপাতালের কাজকর্ম দেখাশোনার পূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে দিলেন কারাধ্যক্ষ মেজর পাটনী। সে-কাজ পেয়ে ডাক্তার রায় খুশিই হলেন। কারাজীবনের বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে সে-দায়িত্ব পালন ক'রে তাঁর শুধু সময়ই কাটলো না, কারাগারের অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসা ক'রে, হাসপাতাল পরিচালন-ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটিয়ে, তিনি কি কারা-কর্তৃপক্ষ, কি কারা-কর্মচারী, কি কয়েদী সকলেরই বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে উঠলেন।

ডাক্তার রায় যখন জেল-হাসপাতালের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, সে-সময় সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে অনেকেই ছিল নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত। তিনি দেখলেন, হাসপাতালে ওই সব রোগের উপযুক্ত ওষুধপত্র নেই। ডাক্তার বিধান তখন নিজে চেষ্টা ক'রে নির্দিষ্ট ওষুধপত্র আনিয়ে নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত কয়েদীদের চিকিৎসা করবার ব্যবস্থা করলেন। তাতে একটা বিশেষ ফল হ'লো। রোগাক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর হার যথেষ্ট ক'মে গেল আগেকার তুলনায়। জেল-কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই খুশী হলেন রাজবন্দী এই ডাক্তারটির ওপর। কারা-বিধি অনুসারে কোনো বন্দী

যদি অপর কোনো বন্দীর জীবন রক্ষা করে, তাহ'লে তার কারাবাসের মেয়াদ কমিয়ে দেওয়ার একটা রীতি আছে। কারাধ্যক্ষ মেজর পাটনী সরকারের কাছে এই ব'লে সুপারিশ করলেন যে, যেহেতু রাজবন্দী ডাক্তার বি. সি. রায় অনেকগুলি কয়েদীর প্রাণরক্ষা করেছেন, সে-হেতু তাঁর কারাবাসের মেয়াদ যতটা সম্ভব বেশি কমিয়ে দেওয়া হোক। কারাধ্যক্ষর যুক্তি মেনে নিয়ে, সরকার তখন ডাক্তার রায়ের কারাবাসের মেয়াদ ছ' সপ্তাহ কমিয়ে দিতে সম্মত হলেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বিধানচন্দ্রের কারাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। অর্থাৎ, পুরো পাঁচ মাসও তাঁকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকতে হয়নি।

কারাগারে থাকতে, বিধানচন্দ্রের সময় কেটে যেতো নানা ভাবে। তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে প্রধান কাজ ছিল দুটি। প্রথমত, জেল-হাসপাতালে গিয়ে রোগী দেখা ও তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয়ত, জার্মান ভাষা শিক্ষা করা। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সে-সময় ডঃ কানাই গাঙ্গুলী নামে একজন রাজনীতিক-বন্দী ছিলেন। জার্মান ভাষায় তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। তাঁর কাছেই বিধানচন্দ্র জার্মান ভাষার পাঠ নেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেই ভাষায় যথেষ্ট রপ্ত হয়ে ওঠেন। হাতে-লেখা জার্মান-লিপি পাঠ, জার্মান ভাষায় বাক্য গঠন এবং জার্মান ভাষার বাক্যকে ইংরেজীতে দিব্যি অনুবাদ করতে শিখেছিলেন কারাবাসের সেই কয়েক মাসে। তাছাড়া, তিনি যে-তলায় যে-সেলে থাকতেন, সেই তলার অন্য চারটি সেলে সেই সময় থাকতেন তাঁর সহকর্মী-বন্ধু যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় আর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের সঙ্গে রোজই দেখা হ'তো, কথাবার্তা হ'তো, জেলের ভিতরকার ছোটো আঙিনায় বেড়াতেন পর্যন্ত।

কারাগারে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের দিন শুরু হ'তো ভোর পাঁচটায়। সেই সময় পূর্বোক্ত আঙিনায় ঘুরে ঘুরে এমনভাবে হাঁটতেন যে, তাতে

ক'রে রোজ তাঁদের প্রাতর্ভ্রমণ হ'তো কমপক্ষে এক মাইল। তারপর চা ও জলখাবার খেয়ে জেল-হাসপাতালের কাজকর্মে ডুবে যেতেন। জেল-হাসপাতালের কাজ যেমন করেছেন, তেমনি করেছেন সহবন্দী রাজনীতিক কর্মী ও নেতাদের চিকিৎসা। সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে সে-সময় তাঁর মনে এই বিশ্বাসই জন্মেছিল যে, তাদের শতকরা ৮০ ভাগ অন্তত স্বভাবদোষে অপরাধী নয়। তখন থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল যে, উপযুক্ত সমাজ-কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংশোধন করা যেতে পারে। বোধকরি, সে-কথা তাঁর মনে জাগরূক ছিল, তাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবার পর, তিনি কারা-বিধি সংস্কারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। কারাগারে আটক সাধারণ কয়েদীরা যাতে জেল-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অন্তত মানবিক ব্যবহার লাভ করে, এবং মুক্তিলাভের পর তারা সমাজে ফিরে গিয়ে পুনর্বাসিত হ'তে পারে, নিজেদের চারিত্রিক দোষত্রুটি শুধরে নিয়ে সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, সেজন্য জাতীয় স্তরে যাতে কারাসংস্কার ঘটে, সেজন্য বিধানচন্দ্র ছিলেন সচেষ্ট।

রাজনীতিক বন্দী হিসাবে জেলে যাবার আগেই, ১৯৩০-৩১ সালের জন্য, ডাক্তার রায় কলকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন। সে-বছরই তাঁকে করপোরেশনের ফিনান্স স্ট্যাণ্ডিং কমিটিরও সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। বহু আগে মেয়র-রূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেমন কলকাতা পুরসভাকে জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন তাঁর উত্তরসাধক বিধানচন্দ্র।

কারাগার থেকে ডাক্তার রায় মুক্তি পান ১৯৩১ সালে। সেই সময় থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলকাতা করপোরেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—কখনো করপোরেশনের মেয়র-রূপে, কখনো-

বা অল্‌ডারম্যান-রূপে।

১৯৩১-৩২ আর্থিক বছরে বিধানচন্দ্র যখন দ্বিতীয় বারের জন্য অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন, সে-বার করপোরেশনের প্রথম সভায়, সুভাষচন্দ্র বসুর প্রস্তাবমতো বিধানচন্দ্র সর্ববাদীসম্মতিক্রমে কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সালেও মেয়র নির্বাচিত হন তিনি। সে-বার তাঁকে অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল দু'জন প্রার্থীর সঙ্গে। তাঁদের একজন জে. এন্. মৈত্র, অন্যজন অখণ্ড বঙ্গের পরবর্তীকালের মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক। তাঁদের দু'জনের চেয়ে অনেক বেশি ভোট পেয়ে বিধানচন্দ্র দ্বিতীয় বারের জন্য কলকাতার পৌরপিতা-পদে অভিষিক্ত হন।

বিধানচন্দ্রকে প্রথমবার মেয়র-রূপে পাবার জন্য দলমতনির্বিশেষে করপোরেশনের সকল সদস্যই যে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, তার মূলে ছিল দুটি কারণ। প্রথম কারণ, বিধানচন্দ্র তখন দেশের চিকিৎসা-জগতের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয় কারণ, তিনি দেশবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানবদরদী মহান সমাজকর্মী ও সংগঠক। নিজের প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার রূপদাতা হিসাবে মেয়র বিধানচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিসে কলকাতার নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় সেদিকে তাঁর যেমন সজাগ দৃষ্টি ছিল, তেমনি কিভাবে পুরসভার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে সেদিকেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সে-সময় কলকাতা করপোরেশনের ব্যয়ের তুলনায় আয়ের মাত্রা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। মেয়র হয়ে ডাক্তার রায় নানা সম্ভাব্য উপায়ে জনহিতকর এই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়িয়ে একে স্বাবলম্বী ক'রে তোলবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শহরের হাসপাতাল ও দাতব্যচিকিৎসালয়গুলিতে করপোরেশনের সাহায্য-দানের জন্য বিধি-প্রণয়ন এবং করপোরেশনের করণিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তনও তাঁর দুটি কীর্তি।

বিধানচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও স্পষ্টবাদিতা ছিল সর্বজনবিদিত। আত্ম-সম্মান ও দেশের সম্মানকে তিনি যেমন সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তেমনি যখন যে-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ থাকতো সেই প্রতিষ্ঠানের সম্মান কেউ ক্ষুণ্ণ করলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসের কথা। বিধানচন্দ্র তখন মেয়র। সেই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইংল্যাণ্ডের একটি খবর ছাপা হয়। সেই খবরে বলা হয় যে, কলকাতার প্রাক্তন পুলিস-কমিশনার স্যর চার্লস টেগার্ট ইংল্যাণ্ডে নাকি কলকাতা করপোরেশনের বিরুদ্ধে কতকগুলি দোষারোপ করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন যে, কলকাতা করপোরেশন এখন 'দেশের কারণে নির্যাতিত ব্যক্তিদের' ('those who had suffered in the country's cause') আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে, এবং 'তার ফলে কয়েক বছর ধরে এই পৌর-প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদীরা ও তাঁদের আত্মীয়বর্গ চাকরিলাভ করেছেন, বিশেষ ক'রে শিক্ষকের অধিকাংশ পদে' ('the result has been that for years this civic body has provided terrorists and their relatives with jobs largely in the capacity of teachers.')। টেগার্ট সাহেব নাকি এমন কথাও বলেছেন যে, তাঁর এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণের জন্য তাঁর কাছে বহু নির্ভুল তথ্য আছে, তাছাড়া করপোরেশনও এ-বিষয়ে অবহিত।

বিষয়টি করপোরেশনের এক সভায় উত্থাপিত হয়। কিন্তু একমাত্র প্রেস-রিপোর্ট ছাড়া টেগার্টের সেই উক্তির আর কোনো প্রামাণ্য দলিল না মেলায়, মেয়র বিধানচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন না। টেগার্ট সাহেবকে একটা চিঠি লিখে বিষয়টি সত্য কিনা, অর্থাৎ, খবরের কাগজে ঠিক যেভাবে বেরিয়েছে ঠিক সেইভাবে টেগার্ট ওই সব কথা বলেছেন কিনা, তা যাচাই ক'রে নেওয়াটা বিধানচন্দ্র তাঁর কর্তব্য ব'লে মনে করলেন। চিঠি লিখলেন

৫

মেয়র-রূপে কলকাতা করপোরেশনে যেমন বিধানচন্দ্রের অদম্য কর্মশক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল, তেমনি ঘটেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-রূপে। ১৯৪১ সালের একেবারে শেষ দিকে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদে নিযুক্ত হন এবং তিন বছর সেই পদে অধিষ্ঠিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত কল্যাণসাধন করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কাছে নতুন কর্মক্ষেত্র নয়। কেননা, এর আগেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হিসাবে শিক্ষাবিষয়ে তাঁর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

যে কয় বছর উপাচার্য-রূপে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে বিধানচন্দ্র তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। তার প্রথমটি হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রদের মধ্যে যারা ইচ্ছুক, তাদের জন্য এয়ার ফোর্স ট্রেনিং, পাইলট সার্ভিস ও গ্রাউণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং শেখাবার ব্যবস্থা করা। সেই প্রশিক্ষণের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তারাই চাকরি পেয়েছে ভারতের বিমান-বাহিনীতে। দ্বিতীয়, কাজটি হ'লো বাংলার সর্বসাধারণের সামাজিক কল্যাণসাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সমাজকল্যাণ-শিক্ষা' কোর্সের প্রবর্তন। আর তৃতীয় কাজটি হ'লো পাটশিল্প সম্পর্কে উচ্চতর অধ্যয়নের ব্যবস্থা। ভারতীয় ছাত্ররা যাতে পাটশিল্প কিভাবে পরিচালিত করতে হয় সেই কলাকৌশল শেখে এবং সেই সঙ্গে পাট

সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে, তার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি কলকাতার বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে স্থাপন করেন 'স্কুল ফর জুট টেক্‌নোলজি'। মহৎ কর্মসাধনে উদ্যোগী পুরুষের কখনো অর্থের অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও হ'লো না। প্রস্তাবিত সেই স্কুলের জন্য ভবন-নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি দেশের পাট-শিল্পপতিদের কাছ থেকে ন'লক্ষ টাকা দান হিসাবে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে গঠনমূলক আরও বহু কাজ করেছিলেন তিনি। যেমন, লাইসেনসিয়েট ডাক্তারদের ডিগ্রী লাভের জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্সের ব্যবস্থা এবং হস্তকলা-শিল্পের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয় উপাচার্য বিধানচন্দ্রের উদ্যোগে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'সাংবাদিকতা'-শিক্ষার যে-ব্যবস্থা রয়েছে, সেই কোর্স প্রবর্তনের পরিকল্পনাটিও ছিল উপাচার্য বিধানচন্দ্রের। অবশ্য, তাঁর সময়ে সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি, হয়েছে বহু পরে।

ডাক্তার রায়ের একটা অসাধারণ গুণ ছিল 'বাজেট' সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সব বিষয় তলিয়ে দেখা এবং ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব নিখুঁত ভাবে তৈরী করা। এ গুণটা ছিল যেন তাঁর সহজাত। অন্য কেউ 'বাজেট'-এর খসড়া রচনা ক'রে দিলে, তিনি একবার তাতে চোখ বুলিয়েই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ধ'রে দিতে পারতেন। শুধু যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'বাজেট'-এর ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা গেছে তা নয়, যখন যে-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন তখনই এমন গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। তা সে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় থাকতেই হোক, বা কলকাতা করপোরেশনে থাকতেই হোক, কিংবা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকতেই হোক। এই প্রসঙ্গে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন: 'আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করবার সৌভাগ্যলাভ করেছি, তাঁরাই লক্ষ্য করেছি ও মনে রেখেছি যে, তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব্ অ্যাকাউন্ট্‌সের সভাপতি, কিংবা উপাচার্য, তখন তিনি বিস্তৃত নথিপত্র ও রেকর্ড-এর

সাহায্য না নিয়েই কত সহজে ও কী বিস্ময়কর তৎপরতায় কোনো বিষয়ের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেছেন অথবা বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব এবং বাজেট উত্থাপন করেছেন।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান-শিক্ষাদান-বিষয়ক পরিষদের সভাপতিরূপে কাজ করবার সময় তিনি যে প্রধানত আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নীতি অনুসরণ ক'রে চলেছেন,—এ-কথাও বলেছেন নীহাররঞ্জন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিভাগসমূহ, মুদ্রণ ও প্রকাশন-বিভাগ দুটি এবং গ্রন্থাগারগুলিকে বিধানচন্দ্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তবে, উপাচার্য-রূপে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল উচ্চতর চিকিৎসা-বিদ্যা, প্রযুক্তি-বিদ্যা ও ব্যবসায়বিদ্যা অধ্যয়নের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত ক'রে স্থায়িত্বদানের মধ্যে।

১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে সম্মান-সূচক ডি. এস্. সি. (ডক্টর অব সায়েন্স) উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯১৯ থেকে ১৯৪৪, এই যে সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর, এর মধ্যেই উন্মেষিত হয়েছে কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের বহুমুখী কর্মশক্তি। আর সেই শক্তিবিকাশের মূলে ছিল তাঁর মানব-প্রীতি, সমাজ-প্রীতি ও দেশপ্রীতি। রোগী-চিকিৎসার বিষয়টি তাঁর কর্মজীবনের কেন্দ্র-মূলে অবস্থান ক'রে তাঁকে সেবাধর্মের বিভিন্ন পথে নিয়ে গেছে। তাঁর সকল কর্মের মধ্যেই নিহিত থেকেছে তাঁর জীবনাদর্শ—মানবসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিধানচন্দ্রের সম্পর্ক যে কত নিবিড় ছিল তার একটি বড়ো প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯২৪ সালে, দেশবন্ধুর মৃত্যুর বছরখানেক আগে। দেশবন্ধু সেই সময় তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির জন্য যে 'ট্রাস্ট' গঠন করেন, তার অন্যতম 'ট্রাস্টী' মনোনয়ন করেন বিধানচন্দ্রকে। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর, সেই ট্রাস্টের নামকরণ হয়

'দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'। সেই ট্রাস্টই 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' পরিচালনা করেন, এবং বিধানচন্দ্র বেশ কয়েক বছর সেবাসদনের সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁর গঠনমূলক কর্মশক্তির পরিচয় দেন। সেবাসদনের হাসপাতালের উদ্বোধনকালে রোগী-শয্যা যেখানে ছিল মাত্র ২৩টি, ডাক্তার রায়ের কর্মদক্ষতা ও উদ্যোগে তিন বছরের মধ্যেই সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পুরো ১০০-তে দাঁড়ায়।

১৯২৪-এরই কোনো এক সময়ে চিত্তরঞ্জন বাংলার পল্লী অঞ্চলের উন্নতিকল্পে অর্থ-সংগ্রহের এক পরিকল্পনা করেন। সেই বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার বাজেট-অধিবেশনে ডাক্তার রায় ইনডিপেনডেন্ট পার্টির পক্ষ থেকে তাঁর ভাষণে বলেন যে, কৃষি, শিক্ষা ও চিকিৎসাদির দিক থেকে বাংলার পল্লী-এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকারের উচিত ছোটো ছোটো কয়েকটি 'ট্রাস্ট বোর্ড' গঠন করা। কিন্তু তদানীন্তন সরকার-বাহাদুর সেই কল্যাণমূলক উদ্দেশসাধনে বিধানচন্দ্রের পরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। দেশবন্ধু তখন পল্লী-উন্নয়ন-মূলক কাজের জন্য অর্থ-সাহায্যের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর কাছে তাঁর ব্যক্তিগত আবেদন জানালেন। তাতে সাড়া মিললো এবং বেশকিছু অর্থ সংগৃহীত হ'লো। গঠিত হ'লো 'পল্লী-পুনর্গঠন পর্ষৎ'। এখানেও চিত্তরঞ্জন তাঁর ভাবশিষ্য বিধানচন্দ্রকে সেই বোর্ডের অন্যতম 'ট্রাস্টি' নিযুক্ত করলেন এবং সেই বোর্ডের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তাঁকেই করলেন সম্পাদক।

১৯২৫-এর ৭ জানুয়ারি, বিশেষভাবে অসুস্থ থাকা অবস্থাতেও, চিত্তরঞ্জন জেদ ধরলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশনে যোগ দিতে যাবেনই। কেননা, সেই দিন গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে 'মন্ত্রিসভা পুনরুজ্জীবিত' করার উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপিত হবে। সে-বিল কিছুতেই যাতে পাস না হয় সেজন্য ব্যবস্থাপক-সভায় কংগ্রেস (স্বরাজ্য দল)-এর নেতা হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাধা দেবেন। তাঁর ধনুর্ভঙ্গ পণ ব্যবস্থাপক-সভাতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন। অথচ, শরীর

অত্যন্ত দুর্বল, কথা বলতে হাঁপিয়ে পড়ছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র তাঁর চিকিৎসা করছিলেন তখন। তাঁকে কাছে ডেকে, দেশবন্ধু তাঁকেই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললেন। বিধান সঙ্গে থাকতে আর ভাবনা কী!—বাড়ির লোকজনের কাছে তাই যেন ছিল তাঁর বক্তব্য। ডাক্তার রায়-ও তখন সাহসের সঙ্গে একটি ইনভ্যালিড চেয়ারে দেশবন্ধুকে শুইয়ে ব্যবস্থাপক-সভাকক্ষে নিয়ে যান এবং সভাশেষে আবার সেইভাবেই তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। এ থেকেই বোঝা যায় দু'জনের মধ্যে পারস্পরিক কী মধুর সম্পর্কই না ছিল।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর সময় ডাক্তার রায় ছিলেন শিলঙে। সেই দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা অভিমুখে রওনা হন। রসা রোডের বাড়িতে গিয়ে যখন দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। বিধানচন্দ্রের সেই প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় গান্ধীজীর সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই দু'জনের প্রতি দু'জনের যেন একটা আত্মিক সম্পর্ক গ'ড়ে উঠলো। পরে সেই সম্পর্ক হয় বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও প্রগাঢ়। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও।

দেশবন্ধুর তিরোধানের আগেই গান্ধীজী শুনেছিলেন যে, চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য যে-ট্রাস্ট গঠন ক'রে গেছেন, বিধান তার অন্যতম 'ট্রাস্টী'। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর, তিনি তাই বিধানচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে, চিত্তরঞ্জনের বাড়িঘর নিয়ে এবারে তাঁরা কী করবেন ব'লে ঠিক করেছেন। বিধান বলেন যে, দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জনের বসতবাড়িকে যদি একটি হাসপাতালে পরিণত ক'রে সেখানে একাধারে চিকিৎসা ও রোগী-সেবাশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহ'লেই সবচেয়ে ভালো হবে। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানান এবং চিত্তরঞ্জন-স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত অর্থ-তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য

দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। সেই সময় অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে মহাত্মাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার রায় সম্ভাব্য বহু দাতার কাছেও গিয়েছেন।

১৯২৬ সালের ছোট্ট একটি ঘটনা। ডাক্তার রায় তাঁর এক রোগীকে দেখবার জন্যে ট্রেনে ক'রে চলেছেন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে। তিনি জানতেন না যে, সেই ট্রেনের পরবর্তী কামরাতেই রয়েছেন গান্ধীজী। রায়পুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে, বিধানচন্দ্রের নজরে পড়লো পরবর্তী কামরা থেকে উঁকি দিয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে ইশারায় কাছে ডাকছেন। এগিয়ে গেলেন বিধানচন্দ্র। মৃদু হেসে গান্ধীজী তখন প্রকাণ্ড একটা চামড়ার বাক্স তাঁকে দিয়ে অনুরোধ করলেন যে, সেই বাক্সে যে-সব জিনিস আছে সেগুলি বিক্রি ক'রে ডাক্তার রায় যেন বিক্রির টাকা ও হিসেবপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। পরে সে-বাক্স খুলে বিধানচন্দ্র দেখতে পান যে, সেই বাক্সের জিনিসপত্রের গায়ে গায়ে একটা ক'রে দাম লেখা আছে বটে, কিন্তু মোট জিনিসের কোনো তালিকা তাতে নেই। অথচ, সব জিনিসের দাম হিসেব করলে তিন থেকে চার হাজার টাকা তো হবেই। তাঁর প্রতি মহাত্মার এই সুগভীর বিশ্বাসের কথা চিন্তা ক'রে ডাক্তার রায় তো অবাক্।

গান্ধীজীর আরও নিকটতর সান্নিধ্যে তিনি আসেন ১৯৩১-এ, পণ্ডিত মতিলাল যখন অন্তিমশয্যায়। তারপর ১৯৩৩-এ গেছেন পুনাতে, মহাত্মা যখন সেখানে ২১ দিনের জন্য অনশনরত। অনশনের তৃতীয় দিন থেকে ডাক্তার রায় গান্ধীজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন, রক্ত পরীক্ষা করেন এবং অনশনভঙ্গের দিন পর্যন্ত তাঁর শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কাহিনী উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সে-কাহিনীও অনশনের পটভূমিকায় এবং সেই পুনাতেই মহাত্মার অনশন, তবে আরও দশ বছর পরের ঘটনা। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর একটি

প্রবন্ধে কাহিনীটি এইভাবে বিবৃত করেছেন :

"১৯৪৩ সালের 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে গান্ধীজী তখন পুনায় আগা খাঁর প্রাসাদে বন্দী। ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন। কিন্তু শরীর খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনশন ত্যাগ করলেন না। অবশেষে ৩রা মার্চ অনশন ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর শরীর তখন দারুণ দুর্বল। ডাঃ বিধানচন্দ্র কী-একটা কাজে বোম্বাই গিয়েছেন। বোম্বাই সরকারের অনুরোধে তিনি গান্ধীজীকে দেখতে গেলেন পুনায়। ডাঃ বিধানকে দেখে খুশী হলেন গান্ধীজী —কিন্তু চিকিৎসা করার কথা শুনে বললেন—ডাঃ বিধান, তোমার চিকিৎসা তো নিতে পারবো না আমি।

"বিধান বিস্মিত হয়ে বললেন—আমার অপরাধ কি জানতে পারি ?

"গান্ধীজী বললেন—আমার দেশের চল্লিশ কোটি দীন-দুঃখীর অসুখে যখন চিকিৎসা করতে পারো না, তখন আমিই-বা তোমার চিকিৎসা নেবো কেন ?

"বিধানচন্দ্র বললেন—এই কথা! মহাত্মাজী, আমি চল্লিশ কোটি নরনারীর চিকিৎসা করতে পারি নি এ-কথা সত্য, কিন্তু এই চল্লিশ কোটি নরনারীর যিনি আশা-ভরসা, চল্লিশ কোটি মানুষ যাঁর মুখের পানে চেয়ে আছে, চল্লিশ কোটি নরনারীর দুঃখ লাঘবের ভার যাঁর হাতে—যিনি বাঁচলে চল্লিশ কোটি বাঁচবে, যাঁর মৃত্যুতে চল্লিশ কোটি মরবে—তাঁর চিকিৎসার ভার সেই চল্লিশ কোটি নরনারী আমার উপর দিয়েছে, আপনি না বললেই-বা আমি শুনবো কেন ?

"গান্ধীজী বললেন—কিন্তু ডাঃ বিধান, তোমার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা তো আমি নিতে পারবো না।

"বিধানচন্দ্র বললেন—মহাত্মাজী, আপনি তো বলেন পৃথিবীর সবকিছুই, এমন কি ধূলিকণা পর্যন্ত সবই ভগবানের সৃষ্টি—এটা আপনি বিশ্বাস করেন ?

"মহাত্মাজী বললেন—নিশ্চয়, সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি।

"তাহ'লে মহাত্মাজী, অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাও কি ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়?

"গান্ধীজী এবারে হেসে ফেললেন—তোমার উকিল কি ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল, তুমি কেন যে আইনজীবী হও নি, তাই ভাবছি!

"ভগবান আইনজীবী না ক'রে চিকিৎসাজীবী করেছেন—কারণ, তিনি জানতেন এমন একদিন আসবে, যেদিন তাঁর সবচেয়ে সেরা ভক্ত—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চিকিৎসার ভার পড়বে আমার উপর।

"মহাত্মাজী হেসে উঠলেন—তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই, তুমি কী ওষুধ দেবে দাও, খাই।"

এইভাবে অসুস্থ গান্ধীজীকে রাজী করিয়ে, ডাক্তার বিধানচন্দ্র তাঁর চিকিৎসা ক'রে, তাঁকে এক সপ্তাহের মধ্যেই নিরাময় ক'রে কলকাতায় ফিরে এলেন।

শুধু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল বা মহাত্মা গান্ধীর মতো দেশবরেণ্য জাতীয় নেতাদের অসুস্থতার সময় তাঁদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন নি ডাক্তার বিধানচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসাও তিনি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। প্রতিদিন সকালে শয্যাত্যাগ ক'রে কবিগুরু-রচিত কোনো ধর্মসঙ্গীত আবৃত্তি করতেন তিনি। তারপর স্বীয় ধর্মানুসারে ব্রহ্মোপাসনা ক'রে দৈনন্দিন কাজ শুরু করতেন।

১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর পরলোকগমনের পর, মৃত্যুশয্যায় শায়িত চিত্তরঞ্জনের একটি ফোটো নিয়ে বিধানচন্দ্র কবির সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। তারপর সেই ফোটোটি রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়ে

তাঁকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, কবি যেন তখনই ফোটোর গায়ে এমন দু'চার লাইন লিখে দেন যাতে ছবিটা জীবন্ত মনে হয়।

ফোটোর দি:কে দৃষ্টিপাত ক'রে রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে, ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে বললেন: ডাক্তার! এ কি প্রেস্‌ক্রিপশন লেখা? এ হ'লো সরস্বতীর আরাধনা। কাজটা কি খুব সহজ? যাই হোক, বিধানচন্দ্রকে বসিয়ে রেখে, দেশবন্ধুর সেই ফোটোখানি নিয়ে কবি চ'লে গেলেন পাশের ঘরে। খানিক বাদেই ফিরে এসে ফোটোখানি ফেরত দিলেন বিধানচন্দ্রের হাতে। ডাক্তার বিধান মুগ্ধবিস্ময়ে লক্ষ ক'রে দেখলেন, দেশবন্ধুর সেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত ফোটোর গায়ে কবির হাতে লেখা চার পঙ্‌ক্তি সাজানো শ্রদ্ধালিপি—

"এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করি' গেলে দান।"

কবি বিধানচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এতে হবে?

অভিভূত বিধান সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেন: হবে তো নিশ্চয়ই। এ যে একটা নতুন ফিলজফি, জগৎকে আপনি এই কয়টি লাইনের মারফত দিলেন।

দেশবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিগুরুর সেই শ্রদ্ধাঞ্জলির কাব্যরূপ সংগ্রহের কৃতিত্ব বিধানচন্দ্রেরই। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের হাতে-লেখা কাব্যকণিকা সমেত চিত্তরঞ্জনের সেই অন্তিম আলোক-চিত্রটির একটি ব্লক তৈরি করালেন ডাক্তার রায়। সেই ব্লকের সাহায্যে অজস্র কপি ছবিও ছাপানো হ'লো সঙ্গে সঙ্গে। সেই সব ছবি বিক্রীত হ'লো, বিধানচন্দ্রের উদ্যোগে, স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে কলকাতার এবং অন্যান্য শহর-গ্রাম-গঞ্জের রাস্তায় রাস্তায়, সভা-প্রাঙ্গণে, এমন কি গৃহস্থদের বাড়িতে বাড়িতে। অল্প কয়েক দিনের

মধ্যে কয়েক লক্ষ ছবি বিক্রি ক'রে যে-টাকা সংগৃহীত হ'লো, তা বিধানচন্দ্রের উদ্যোগেই জমা পড়লো 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন'-এর জন্য নির্মিত তহবিলে।

১৯৩১-এ বিধানচন্দ্র যখন কলকাতার মেয়র, সেই সময় কবিগুরুর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথকে এক নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেই উপলক্ষে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র-লিখিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন পৌর-প্রধান ডাক্তার বিধানচন্দ্র। তাঁর সুস্পষ্ট জলদ্‌গম্ভীর-কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল ঃ "তোমার সর্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনা-প্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাংলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে এবং তোমার লেখনী-নিঃসৃত অমৃতধারা বাঙালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞানগুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।"

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে ভাষণ দিতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেবারও কবির সঙ্গে ছিলেন বিধানচন্দ্র এবং তিনিই কবিগুরুকে সভামঞ্চে এগিয়ে নিয়ে যাবার কর্তব্যপালন করেন।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ যেবার অসুস্থ অবস্থায় শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এলেন, সেবার তাঁর চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র।

এই যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যিনি, বহু কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেছিলেন, তাঁর সেই প্রতিষ্ঠান

গড়বার আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখা যায় বলতে গেলে তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যেমন বাঙালী তরুণদের কেরানীগিরির মোহ কাটিয়ে স্বদেশী শিল্প গ'ড়ে তোলবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল্‌স্ অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস'-এর প্রতিষ্ঠা করেন, ডাক্তার বিধানচন্দ্রও তেমনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করতে করতেই 'বেঙ্গল ইমিউনিটি' নামক ভেষজ ঔষধ-উৎপাদনকারী শিল্প-সংস্থার গোড়াপত্তন করেন।

এরই কাছাকাছি এক সময়ে, 'যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল'-এর সূচনাও করেন তিনি। সেই সূচনাও হয় একটা অদ্ভুত যোগাযোগের সূত্রে। প্লুরুসিতে আক্রান্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ নামে একটি বাঙালী তরুণের চিকিৎসা করেছিলেন ডাক্তার রায়। ছেলেটি ছিল এক মেডিকেল ছাত্র। ডাক্তার রায়ের চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে দু'তিন বছর বেশ ভালোই ছিল। পরে ১৯১৭ সালের শেষদিকে সে আবার অসুস্থ হ'য়ে একেবারে শয্যাগত হ'য়ে পড়ে। ক্রমে তার সেই রোগ যক্ষ্মারোগে পর্যবসিত হয়। আবার ডাক্তার রায়ই তার চিকিৎসার ভার নেন এবং আত্মীয়-স্বজন কেউ তার দেখাশোনা না করায়, ছেলেটি বিধানচন্দ্রের স্নেহযত্নে এতটা মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে, সব ব্যাপার নিয়েই সে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতো। এটা সে বুঝতে পেরেছিল যে, যে-কালব্যাধিতে সে আক্রান্ত হয়েছে, তাতে তার বাঁচবার আশা খুবই কম। তাই সে তার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করবার জন্য আগ্রহী হয়ে ডাক্তার রায়ের পরামর্শ চায়। উত্তরাধিকার-সূত্রে সে তার বসতবাড়ির অর্ধেকটা পেয়েছিল। তার কথা শুনে, ডাক্তার রায় তাকে বলেছিলেন যে, যে-রোগে আক্রান্ত হয়ে সে কষ্ট পাচ্ছিল, সেই রোগের চিকিৎসার জন্য সে তার সম্পত্তি 'উইল' ক'রে দিতে পারে। কেননা, সে-যুগে কলকাতা বা বাংলা-প্রদেশে যক্ষ্মারোগীদের পৃথকভাবে চিকিৎসা করাবার জন্য কোনো পৃথক হাসপাতাল তো

ছিলই না, উপরন্তু সাধারণ হাসপাতালগুলিতেও না ছিল পৃথক্ কোনো শয্যার ব্যবস্থা। সেকালে হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ডেই যক্ষ্মা-রোগীদের রাখা হ'তো।

বিধানচন্দ্রের পরামর্শটি প্রভাসচন্দ্রের মনঃপূত হয়েছিল। তাই সেই উদ্দেশ্যে সে তার 'উইল' সম্পাদন ক'রে দিয়ে যায়, এবং 'উইল' অনুসারে কর্মসম্পাদনের জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বি. কে. ঘোষ, আর ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে একজিকিউটর হিসাবে দায়িত্ব দিয়ে যায়। উইলে সে এই নির্দেশ দিয়েছিল যে, তার মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যে একটি যক্ষ্মা-হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে; তা যদি সম্ভব না হয়, তা'হলে সম্পত্তি বিক্রির টাকাটা যক্ষ্মারোগ-বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান ক'রে দিতে হবে।

প্রভাস মারা যায় ১৯১৮ সালের শেষদিকে। তার শেষকৃত্যও সম্পাদন করেন মানবদরদী ডাক্তার বিধানচন্দ্র। কর্তব্যের খাতিরে যদিও তিনি তার ভাইকেই বলেছিলেন পরলোকগত প্রভাসের শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করতে। কিন্তু সেই ভাইটি যখন নিষ্ঠুরভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার ক'রে চ'লে যায়, তখন ডাক্তার রায় নিজেই সব ব্যবস্থা করেন। এখানেও সেই মানবতাবোধ ও প্রকৃত মনুষ্যত্বেরই পরিচয় দিয়েছিলেন বিধানচন্দ্র। বেলা তখন সকাল দশটা। সে-সময় মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের ডেকে এনে মৃতদেহ শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি তাই নিজেই তাঁর দুই-আসন-বিশিষ্ট মোটরগাড়ির মাথায় শবদেহ-সমেত খাটিয়াটি বেঁধে নিয়ে নিজের হাতে গাড়ি চালিয়ে চ'লে যান শ্মশানঘাটে। সঙ্গে থাকেন এক স্নেহাতুরা ভদ্রমহিলা, যিনি সেই পরলোকগত তরুণের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। শ্মশানঘাটে পৌঁছে তাঁরা দু'জনে মিলে শবদাহের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। তারপর চিতার আগুন নিভে গেলে, শেষকৃত্যটুকু সুসম্পন্ন ক'রে বাড়ি ফেরেন বুকভরা অসীম বেদনা নিয়ে।

প্রভাসচন্দ্রের সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি থেকে মোট যে দু'লক্ষ টাকা

পাওয়া যায়, তা থেকেই বিধানচন্দ্রের পরিকল্পিত যক্ষ্মা-হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ চলে। কলকাতার শহরতলী যাদবপুর এলাকা তখন ছিল উন্মুক্ত, শান্ত ও প্রায় নির্জন। সেইখানে প্রস্তাবিত হাসপাতালের জন্য জমি কিনে বাড়িঘর বানানোর প্রাথমিক পর্ব শেষ হয় ১৯২৩ সালে। গোড়ায় সেখানে মাত্র চারটি রোগী-শয্যা স্থাপিত হয়। আর, প্রথম যক্ষ্মা-রোগীকে সেখানে ভর্তি ক'রে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয় ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তারপর যথাসময়ে বাকি তিনটি শয্যাতেও রোগী চলে এলো। বিধানচন্দ্র তাদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মুস্কিলে পড়েন কিছুদিন যেতে-না-যেতেই। টাকার সীমাবদ্ধতা একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। ডাক্তার রায় হিসেব ক'রে দেখেন যে, মাত্র ওই চারজন যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার জন্যে মাসে প্রায় একহাজার টাকার মতো লাগছে। সেই খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শুধু রোগীদের জন্য ওষুধপত্র, পথ্যাদি আর নার্স ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের বেতন। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার রায় স্বয়ং বলেছেন: "ট্রাস্ট-সম্পত্তির মধ্যে এমন তহবিলের ব্যবস্থা ছিল না যা দিয়ে হাসপাতালের খরচ-খরচা মেটানো সম্ভব। আমি তাই ঠিক করলাম, খুব বেছে বেছে রোগী নেবো এবং তাদের চিকিৎসা ক'রে কী রকমের সুফল পাওয়া যায় তা লক্ষ্য করব। আমি রোজ একবার ক'রে, দরকার হ'লে কোনো কোনো দিন দু'বার ক'রেও সেখানে যেতাম, রোগীদের চিকিৎসা করতাম। এজন্য মাসে মাসে যে টাকা লাগতো তা আমি আমার নিজস্ব উপার্জন থেকেই মেটাতাম।"

এইভাবে জনদরদী বিধানচন্দ্র তাঁর স্বোপার্জিত অর্থের অনেকটাই ব্যয় করেছিলেন তাঁর হাতে-গড়া যক্ষ্মা-হাসপাতাল চালাবার জন্য। যাদবপুরের সেই মুক্ত পরিবেশে, এইভাবে একশ' যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসা ক'রে, ১৯২৯ সালে ডাক্তার রায় যখন রোগীদের ভালো ক'রে তুলতে সক্ষম হলেন, তখন তাঁর মনে নতুন আশা ও

উদ্দীপনার সঞ্চার হ'লো। তিনি তখন সংবাদপত্র মারফত সেই একশ' যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসার ফলাফল প্রকাশ ক'রে, দেশবাসীর কাছ থেকে যক্ষ্মা-হাসপাতাল চালাবার ও তার সম্প্রসারণের জন্য অর্থ-সাহায্যের আবেদন করলেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার, সংবাদপত্রে বিধানচন্দ্রের সেই আবেদন প্রকাশিত হবার পরের দিনই এক ভদ্রলোক এসে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন যে, তিনি ওই যক্ষ্মা-হাসপাতালের জন্য পৌনঃপুনিক সকল ব্যয়-নির্বাহের দায়িত্ব নিতে রাজী আছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে ডাক্তার রায় তাঁর দিকে তাকালেন। সেই প্রসঙ্গে বিধানচন্দ্রের নিজস্ব উক্তি: "তিনি শুধু বলেছিলেন তাঁর উপার্জন বেশ ভালো, কিন্তু কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। থাকবার মধ্যে ছিল এক ভাইপো, সে যক্ষ্মা-রোগে মারা গেছে। ভদ্রলোক তাই মনস্থ করেছেন যে, যক্ষ্মা-হাসপাতাল চালাবার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।"

প্রয়াত এক যক্ষ্মা-রোগীর সম্পত্তির টাকায় যাদবপুরে ডাক্তার বিধানচন্দ্র একদা যে যক্ষ্মা-হাসপাতালের গোড়াপত্তন করেছিলেন, আর এক প্রয়াত যক্ষ্মা-রোগীর পিতৃব্যের অর্থানুকূল্যে তিনি সেই হাসপাতাল চালাবার মতো শক্তিসঞ্চয় করলেন। হাসপাতালের ট্রাস্ট-বোর্ড এর অনেক আগেই 'ক্যালকাটা মেডিকেল এড্ অ্যাণ্ড রিসার্চ সোসাইটি' নামে যে-সমিতি গঠন করেছিলেন, তার প্রথম সভাপতি ছিলেন বিধানচন্দ্রের অন্যতম অধ্যাপক ও স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার নীলরতন সরকার। আর, ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় ছিলেন সেই সমিতির সম্পাদক। ডাঃ কুমুদশঙ্কর যখন সেই যক্ষ্মা-হাসপাতালের কাজকর্ম দেখাশোনা ও রোগীদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন, তখন থেকে বিধানচন্দ্র কিছুটা ভারমুক্ত হলেন। তবে, এই হাসপাতালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল সারা জীবন।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠার কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

সেই প্রসঙ্গে এ-কথাও বলা যেতে পারে যে, এই সেবাসদনের অন্তর্গত সমস্ত চিকিৎসা-বিভাগের গোড়াপত্তন, উন্নতি ও সম্প্রসারণও সম্ভব হয়েছে ডাক্তার রায়েরই উদ্যোগে। ভারতের অন্যতম বৃহৎ প্রসূতি হাসপাতাল রয়েছে এই সেবাসদনেই। তাছাড়া, এখানকার শিশুসদন, হাইড্রো-রেডিওলজিক্যাল ইন্স্টিটিউট, এবং ক্যানসার-হাসপাতালও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন' (পরবর্তীকালের 'ভিক্টোরিয়া কলেজ')-এর উন্নয়নের জন্যও ডাক্তার রায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এবং নিজের অর্থ ব্যয় করেছেন। গোড়ার দিকে এই শিক্ষায়তনের জন্য কোনো স্থায়ী ভবন ছিল না। সেই ভবন নির্মিত হয় বিধানচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায়। প্রথমে স্কুলের জন্য, পরে কলেজের জন্য। তারপর একে একে গ'ড়ে ওঠে স্কুল ও কলেজের ছাত্রী-আবাস। স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে এই শিক্ষায়তনের অবদান যথেষ্ট। আর, সেই কাজে যুক্ত হয়ে আছে সমাজসেবী বিধানচন্দ্রের নিরলস উদ্যম।

এঞ্জিনীয়ারিং না প'ড়ে বিধানচন্দ্র ডাক্তারি পড়েছিলেন। কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বরাবর। এঞ্জিনীয়ারিং-শিল্পের প্রতি তাঁর যেমন একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল, তেমনি ছিল কারিগরি তথা প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র বসু এক জায়গায় লিখেছেন: "বিধানচন্দ্রের সর্বতোমুখী প্রতিভার একদিক তাঁর শিল্পোদ্যোগ। তাঁর অন্যান্য কর্ম বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শিল্পোদ্যোগই তাঁকে প্রখ্যাত ক'রে তুলতে পারতো, এমনই ছিল তাঁর

বিচক্ষণ কর্মক্ষমতা এবং দূরদর্শিতা। শিলং শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপন তাঁর প্রাথমিক কর্মজীবনের এক সাফল্য-মণ্ডিত ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ।”

সে হ'লো ১৯২০ সালের কথা। সেই বছর তিনি প্রথম শিলঙে বেড়াতে যান। আমিনগাঁ স্টেশন থেকে মোটরগাড়িতে চেপে তিনি ও সহগামীরা যখন শিলঙ শহরে গিয়ে পৌঁছান তখন চতুর্দিক অন্ধকার। রাস্তায় আলো নেই—কোনো বাড়িঘর বা দোকানপাটেও ইলেক্‌ট্রিক আলো নেই। না, লোডশেডিং নয়! কেব্‌ল্-ফল্ট্‌ও নয়! আসলে, তখনও পর্যন্ত শিলঙের মতো সুন্দর পার্বত্য-শহরে বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অথচ বিদ্যুৎ তো সহজেই উৎপাদিত হ'তে পারে শিলঙের জলপ্রপাত থেকে। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মতোই একটা চিন্তা যেন তাঁর মাথায় খেলে গেল। তাই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, এক ডাক্তার-বন্ধু তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আর. দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। সেই দত্ত সাহেব ও তাঁর এক বন্ধু দু'জনে মিলে 'বীডন জলপ্রপাত'-এর ইজারা নিয়েছিলেন। কিন্তু তা থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কোনো চেষ্টাই তাঁরা তখনও পর্যন্ত করেন নি। তখন ডাক্তার রায় তাঁদের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথাবার্তা বলেন এবং জলবিদ্যুৎ-প্রকল্পের জন্য একটি কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব দেন।

শেষপর্যন্ত অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে বিধানচন্দ্রের সেই শিল্পোদ্যোগ বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৯২৩ সালে। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যম ও কর্মকুশলতায় মাত্র আঠারো মাসের মধ্যে শিলঙে সেই জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় এবং শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে থাকে।

যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উন্নতি-বিধান ও মর্যাদা-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও ছিল ডাক্তার রায়ের আন্তরিক প্রয়াস। স্বাধীনতালাভের

পূর্ববর্তী কয়েক বছরের মধ্যে, 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ'-এর সভাপতি হিসাবে, বিধানচন্দ্রের কর্মোদ্যোগে এই কলেজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই কলেজ থেকে যে-ডিগ্রী দেওয়া হয়, তা স্বীকৃতি লাভ করে ইন্সটিটিউট অব এঞ্জিনীয়ার্সের, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের, এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের। আর, সেই স্বীকৃতি-লাভের ব্যাপারে বিধানচন্দ্রই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। তারপর, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ার ব্যাপারেও ছিল শিক্ষাদরদী বিধানচন্দ্রের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, এবং 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'কে তিনি 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়' ব'লে আনন্দ পেতেন। ডঃ ত্রিগুণা সেন এক জায়গায় লিখেছেন ঃ কথাটা ঠিকই, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়' প্রকৃতপক্ষে তাঁরই। কিন্তু তা হ'লো, বিধানচন্দ্রের কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা, অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের পরবর্তী কালের ঘটনা।

বিধানচন্দ্র রাজনীতিক ছিলেন এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি এ-কথাও মিথ্যা নয় যে, পেশাদার রাজনীতিক তিনি ছিলেন না কোনো-দিনই। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল অন্য জিনিস। রাজনীতি বলতে তিনি বুঝতেন যে-নীতির দ্বারা জনগণের কল্যাণ করা যায়, যে-নীতির দ্বারা সমাজের ও সামাজিক পরিবেশের উন্নতিসাধন করা যায়। একজন সুদক্ষ চিকিৎসক হিসাবে তিনি যেমন রোগীর নাড়ি না টিপেও, তার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই রোগনির্ণয় করতে পারতেন, তেমনি দেশের দিকে তাকিয়ে, দেশের তখনকার রাজনীতিক জটিলতার দিকে তাকিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আসল গলদ কোথায়। সেই কারণে তিনি তখনকার গোষ্ঠীগত বা দলগত রাজনীতি এড়িয়ে চলতেন। তিনি বলতেন, "কোনো চিকিৎসাজীবীর পক্ষে দলগত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব নয়। কেননা, একজন ডাক্তারের কাছে শত্রু-মিত্রে, ধনী-দরিদ্রে, শ্বেতাঙ্গে-কৃষ্ণাঙ্গে কোনো

ভেদাভেদ নেই। তিনি প্রত্যেকেরই সেবা করবেন, সর্বজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সচেষ্ট থাকবেন,—সে-ব্যাপারে কে কোন্ শ্রেণীগত বা কে কোন্ দলের তা বিচার ক'রে দেখতে যাবেন না।"

তাঁর এই রাজনীতিক-দর্শনের জন্যই তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরোধে অথবা 'ক্রীপ্‌স্-দৌত্যের' ব্যাপারে সক্রিয় কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। বিধানচন্দ্রের কাছে সকল ভারতবাসীই ছিল তাঁর আপনজন, তাঁরই মতো ভারতীয়—তা সে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, কিংবা অপর কোনো ধর্মাবলম্বীই হোক। রাজনীতিকদল হিসাবে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক-দাবিগুলি তিনি কোনোদিনই সমর্থন করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কায়েদ-ই-আজম জিন্নার সঙ্গে তাঁর ছিল খুবই ভালো সম্পর্ক; অপরদিকে বিধানচন্দ্রের সংযত মতামতের প্রতি এবং চিকিৎসা-জগতে তাঁর অসামান্য দক্ষতার প্রতিও জিন্নাসাহেবের ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা। মোট কথা, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের বিশেষ সক্রিয় কোনো ভূমিকা ছিল না। সে-সময় ভারতীয় চিকিৎসকদের সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি পায় সে-বিষয়েই তিনি ছিলেন অধিকতর যত্নবান।

ভারত থেকে যে-সব মেডিকেল-মিশন দেশের বাইরে, বিশেষ ক'রে দূর-প্রাচ্যের দেশগুলিতে প্রেরিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ডাক্তার রায়ের নামও চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতীয় মেডিকেল মিশন চীনে যায় ডাঃ অটলের নেতৃত্বে। কিন্তু যাবার আগে, ডাঃ অটল বিধানচন্দ্রের কাছ থেকে নানা বিষয়ে সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং পেয়েও ছিলেন। ডাক্তার রায় চীনে প্রেরিত সেই মেডিকেল মিশনের জন্য চিকিৎসার অনেক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম যেমন জোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন, তেমনি জুটিয়ে দিয়েছিলেন দু' তিনজন চিকিৎসা-কর্মীকে। তবে, মালয়ে যে ভারতীয় মেডিকেল মিশন পাঠানো হয়, সেই ব্যাপারে ডাক্তার বিধানচন্দ্রেরই ছিল মুখ্য

ভূমিকা। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মালয় থেকে ফিরে এসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিধানচন্দ্রের কাছে সেখানকার সামাজিক দুর্দশার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেন। বিশেষ ক'রে জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে যুদ্ধোত্তর মালয়ের অবস্থা ছিল শোচনীয়। পণ্ডিত নেহরু তাই ডাক্তার রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কংগ্রেসের তরফ থেকে অবিলম্বে মালয়ে একটি ভারতীয় মেডিকেল মিশন পাঠানো যায় কিনা ভেবে দেখতে। ডাক্তার রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন মেডিকেল মিশন পাঠাবার সব ব্যবস্থা করতে। জওহরলাল তখন উদ্যোগ নিলেন অর্থ-সংগ্রহের জন্য, দেশবাসীর কাছে প্রচার করলেন তাঁর আবেদন। আর, অন্যদিকে বিধানচন্দ্র ওষুধপত্র কেনাকাটা থেকে শুরু ক'রে মিশনে কোন্ কোন্ ডাক্তার ও চিকিৎসা-কর্মী যাবে তাদের নির্বাচন করলেন। তাছাড়া, কলকাতা থেকে মালয়ে গিয়ে মিশনের কর্মীরা যাতে-না যানবাহনের কোনো অসুবিধা ভোগ করে, তার জন্য যানবাহন পাঠাবার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয়, সিঙ্গাপুরে ও অন্যত্র তাঁর যে-সব বন্ধু ছিল তাঁদের কাছে চিঠি লিখে মিশনের কাজে সহায়তা করতে অনুরোধ করলেন, সে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। কিন্তু, ডাক্তার রায় তাঁর চরিত্রগত অসীম উৎসাহ ও দক্ষতাগুণে সেই মেডিকেল মিশন পাঠাবার প্রতিটি কাজ নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করলেন। এক মাসের মধ্যেই (১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে) বিধানচন্দ্রের উদ্যোগে ও পরিকল্পনা-মতো ভারতীয় মেডিকেল মিশন চ'লে গেল মালয়ের জনগণের সেবার কাজে। সেই মিশন সেখানে একটানা সাত মাস কাজ ক'রে জনস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করে।

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়, নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রেও মানবদরদী বিধানচন্দ্র যেভাবে জনসেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, তা তাঁর চরিত্রকেই মহিমান্বিত করেছে। ডাক্তার

রায় বলেছেন : "সে-সময় আমার অন্যতম প্রধান কাজ হয়েছিল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় যে-সব মৃতদেহ সংকারের অভাবে প'ড়ে ছিল, তাদের তুলে এনে যথাযথভাবে সংকারের ব্যবস্থা করা।" সে-সময় তিনি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীর সাহায্যে একদিন-কি-দু'দিনের মধ্যেই প্রায় ১৪০০ গলিত ও অর্ধগলিত মৃতদেহের সংকার করেন। তাছাড়া, সেই সময় শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে গিয়ে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-দান ও তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তিনি করেন। এমন কি দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকার ছাত্রাবাস থেকে ভীত সন্ত্রস্ত ছাত্রদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে তাদের প্রাণরক্ষাও করেছেন তিনি।

৬

বিধানচন্দ্রের জীবনে কি মহাত্মা গান্ধীর কোনো প্রভাব ছিল ? হ্যাঁ, ছিল বৈকি। ছেলেবেলা থেকে বিধানচন্দ্র তাঁর মা-বাবার কাছ থেকে ঈশ্বর-বিশ্বাস, মানবসেবা ও স্বার্থত্যাগের যে-আদর্শ লাভ করেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও সেই আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। গান্ধীজীর মুখের কথায় ও কাজের মধ্যে কোনো অমিল ছিল না, অর্থাৎ তিনি যা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, সে-কথা অকপটেই তিনি ব্যক্ত করতেন। তাঁর সেই আচরণ বিধানচন্দ্রের কাছে ছিল অত্যন্ত প্রশংসার বস্তু। মহাত্মার কর্মজীবনের আদর্শ ছিল গীতার সেই বাণী—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—অর্থাৎ, কর্মেই তোমার অধিকার, তার ফলাফলে কখনো নয়। সহজ কথায় যাকে বলে—কাজ ক'রে যাও, সফলতার কথা চিন্তা ক'রো না। বিধানচন্দ্রের জীবন-দর্শনও ছিল তাই। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন : "সারা জীবনে আমি বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার হাতে নিয়েছি, তার অনেকগুলিই ছিল আমার দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার বাইরে। বিফল হ'তে হ'তে, সফলও হয়েছি কখনো কখনো। তবে যখনই কোনো কাজ হাতে নিয়েছি, তখনই আমার চেষ্টা থাকতো কাজটাকে সর্বশক্তি দিয়ে সুসম্পন্ন করবার।"[১]

গান্ধীজী প্রসঙ্গে বিধানচন্দ্র বলেছেন : "আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা পারস্পরিক আকর্ষণ থাকলেও, বহু বিষয়ে পার্থক্যও ছিল। তিনি মনে করতেন দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ সবই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট। তাই দুঃখ-কষ্ট

সহ্য করার এবং সর্বস্ব ত্যাগ করবার একটা অপরিসীম সাহস ছিল গান্ধীজীর। সে-ধরনের সাহস আমারও আছে, এ-কথা আমি বলতে পারি না। তবে, মানুষের সেবার কাজে নিজেকে নিয়োগ করবার অনুপ্রেরণা আমি নিজের মধ্যে বরাবরই অনুভব ক'রে এসেছি।"[২]

বিধানচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু যাকে বলে অন্ধভক্ত,—তা তিনি কোনোদিনই ছিলেন না। তর্কাতীত-ভাবে মহাত্মার সব মতামত তিনি গ্রহণও করেন নি। গান্ধীজীর কোনো নীতি, কর্মসূচী বা দর্শন সম্বন্ধে বিধানচন্দ্র যখন ব্যক্তিগতভাবে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হ'তে পারতেন না, তখন সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মহাত্মার সঙ্গে তাঁর তর্কালোচনা পর্যন্ত হ'তো। কাজেই, গান্ধীবাদ সম্পর্কে বিধানচন্দ্রের মূল্যায়ন কী তা আমাদের কাছে কৌতূহলের বিষয়।

গান্ধীবাদ সম্বন্ধে বিধানচন্দ্র লিখেছেন: "গান্ধীবাদ ব'লে যা অভিহিত; তা হ'লো অহিংসা ও সত্যের আদর্শে তাঁর আস্থামূলক ঘোষণা। গান্ধীজীর এই মূল তত্ত্ব থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁর অনুগামীদের প্রতি অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অথবা খাদি ব্যবহার সংক্রান্ত উপদেশাবলী।

"আমাদের জীবনে—তা ব্যক্তিগতই হোক বা সমষ্টিগতই হোক—সত্য ও অহিংসার নীতিকে স্থান দিতে হবে সবার উপরে, এই মূল ধ্যানধারণায় আস্থাশীল ছিলেন গান্ধীজী। এই দুটি নীতি বলতে কী বোঝায় তা একবার বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক। এ দুটি কি পৃথক্ পৃথক্ নীতি, না একের মধ্যেই এরা অন্তর্লীন? যা অহিংস তাই সত্য, আর যা সত্য তাই অহিংস। এই মন্তব্যে কী ক'রে আমরা পৌঁছুতে পারি? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী ঘটছে? প্রতিনিয়ত আমরা এমন সব ঘটনা বা অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি যেখানে রয়েছে কল্পনা, আদর্শ বা কর্মের সংঘাত। সেই সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাধান করতে হবে অহিংসার পথে। তার অর্থ হলো গায়ের জোরে প্রতিপক্ষের চিন্তাধারাকে নস্যাৎ না ক'রে, অথবা শত্রুর বাক্‌রোধ না ক'রে, তাদের

বক্তব্যের স্বপক্ষে যে-সব যুক্তি সেগুলি শাস্ত মনে বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে, বুঝতে হবে সেগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেও সত্য ও সাধু ব'লে প্রতিভাত হয় কি না। তা যদি করা হয়, তাহ'লে এইভাবে যে-কোনো ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের প্রতি বলপ্রয়োগ না ক'রেই তার যুক্তিসমূহের মধ্যে একটা অর্থ খুঁজে পাবে অথবা তার কাজের প্রতিবাদও করতে পারবে। অপর দিকে, কেউ যখন বিপদে পড়ে বা বিরোধীর সম্মুখীন হয়, তখন যদি সে সেই বিপদ বা বিরোধিতার মুখোমুখি হ'তে অনিচ্ছুক হয়,—বুঝতে হবে, সেটা হ'লো 'এড়িয়ে যাবার' একটা চেষ্টা। আমরা যদি বিপদে পড়ি এবং তা থেকে পালিয়ে যাই,—কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয়েও তাকে এড়িয়ে যাই, তাহ'লে গান্ধীজী বলবেন ওটা হ'লো 'দুর্বলের অহিংসা'।

"কাজেই গান্ধীবাদের যাঁরা সমর্থক, তাঁদের পক্ষে অহিংসার মনোভাব নিয়ে সাহসের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করা অত্যাবশ্যক। এই মোকাবিলার ফলাফল যদি অহিংস-নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিটির অনুকূল নাও হয়, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিরোধের বিষয়টিকে অপরিহার্য ভাবা ঠিক নয়। গান্ধীবাদীর বিপক্ষেও তা যেতে পারে। এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে পরাস্তও হ'তে পারে। সে হয়তো দেখতে পারে যে, তার প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করবার মতো শক্তিশালী অব্যর্থ তীর তার তূণে নেই। প্রতিপক্ষ অনেক বেশী শক্তিশালী। তথাপি, একেবারে চেষ্টা না ক'রে 'চেষ্টা ক'রে বিফল' হওয়াই অধিকতর শ্রেয়ঃ। অহিংসার মনোভাব নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হ'তেই হবে।

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—এ হ'লো শাস্ত্রের কথা; যার অর্থ হ'লো, 'আমরা, মানুষেরা, আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে কেবল কাজ করবারই সুযোগ পেয়েছি, কাজের ফলাফল রয়েছে ঈশ্বরের হাতে।'—গান্ধীজীও বলতেন যে, 'কর্মফল কখনো কর্মপন্থার উপরে নির্ভর করে না।' পৃথিবীর মানুষ আমরা সাধারণত বিপরীত পন্থাই

অনুসরণ ক'রে থাকি। আমাদের মন প'ড়ে থাকে কর্মফলের দিকে। আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য আমরা, ভালো হোক খারাপ হোক, যে-কোনো উপায়ই অবলম্বন করি। 'সত্য'-কে আমরা শুধু একান্ত-ভাবে পরিহার-ই করি না, তার প্রতি 'সহিংস' হয়ে উঠি। সাধারণ মানুষেরা লড়াই করতে নেমে কেবল জিততেই চায়, সে-লড়াই সঙ্গত-ভাবে ও সঠিক পথে করার কথা ভাবে না। এ-ক্ষেত্রে গোড়া থেকেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় কর্মপন্থা। আর, প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় তা অসৎ। সেই কারণেই গান্ধীজীর মতে আমরা যদি সত্যের পথ বেছে নিই, তাহ'লে হিংসা-কে এড়াতে পারি। তাঁর কথামতো অন্যভাবে বলা যায়—যা সত্য তা অহিংসও বটে। সত্য কখনো হিংসা বা পীড়নকে প্রশ্রয় দেয় না, কারণ যে সত্যনিষ্ঠ সে অন্যের সত্যকেও গণ্য করে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সত্য ও অহিংসার পথ অনুসরণ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কেননা, এই পৃথিবীতে 'একমাত্র সত্য' ব'লে কিছু নেই।

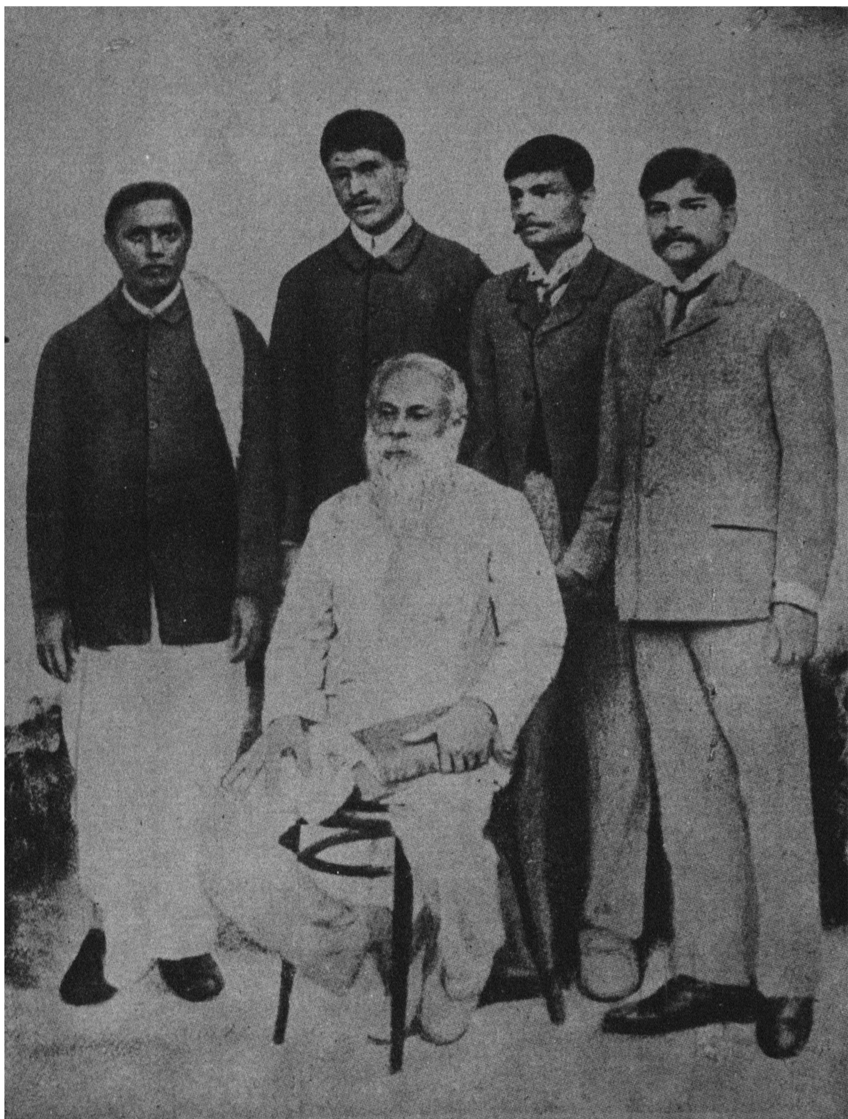
"আজ যা সত্য ব'লে মনে হচ্ছে, কাল হয়তো তা মিথ্যায় পরিণত হবে। মানুষ আজ যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করেছে, এবং যেগুলি তার কাছে সত্য ব'লে প্রতিভাত, সেগুলি নিয়ে ভালো ক'রে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে হয়তো দেখা যাবে সেগুলি মিথ্যা। হিমালয়ের কোনো শৃঙ্গ দেখে হয়তো মনে হ'লো সেই শৃঙ্গটিই গোটা পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ; কিন্তু আরও উঁচুতে উঠতেই লক্ষ্য করা গেল, সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সেটি নয়, প্রকৃত সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি তার চেয়ে অনেক বেশী উঁচু। জাগতিক বিশ্বের ক্ষেত্রে তা যদি সত্য হয়, তাহ'লে তা আরও সত্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় ধারণা নয়, অন্তর্মুখী উপলব্ধিই আমাদের পথের দিশারী। সেই অন্তর্মুখী মানসলোকের ক্ষেত্রে, এক-একজনের উপলব্ধি নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিকতা, তার বাল্য ও যৌবনের শিক্ষা, পরবর্তীকালের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উপর। 'সত্য' কী তা নির্ধারণ করবার ক্ষেত্রে এক-

একজনকে তার নিজের বিচার-বিবেচনার উপরেই নির্ভর করতে হয়। তার ফলে কী হয়? না, এই মুহূর্তে যা সত্য ব'লে মনে হয়েছিল, পরমুহূর্তেই তা মিথ্যা ব'লে প্রতিভাত হ'লো। এ থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার এই যে, সত্যোপলব্ধির জন্য চাই ব্যক্তিগত 'সাধনা', 'তপস্যা' এবং বিভিন্ন রকমের নিয়মানুবর্তিতা। সত্যোপলব্ধির জন্য বিভিন্ন নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন অত্যাবশ্যক। নিজের কর্মধারা ও চিন্তাধারার প্রতি সদা সতর্কতা অবলম্বন ক'রে সে-কাজও সম্ভব হতে পারে। এ-ধরনের তপস্যা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করতে হ'লে, যে-সব ভাবাবেগ মানুষের পাশব সত্তাকে জাগ্রত করে —যথা, ক্রোধ, ঈর্ষা ইত্যাদি—শপথ নিয়ে সেগুলিকে পরিহার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, ওই সব ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্যই নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন। মানুষ এইভাবে নিজেকে যত বেশী পরিশুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে, সে তত বেশী নিজেকে নিয়মানুবর্তী করতে পারবে। মানুষ যত বেশী ব্যক্তিগত আবেগ ও উত্তেজনা দমন ক'রে শাশ্বত, চিরন্তন ও প্রকৃত অবস্থার অধীন হতে পারবে, তত বেশী ক'রে সে 'সত্য'-কে উপলব্ধি করতে পারবে। চিন্তা ও কর্মে কেউ যদি সহিংস থাকে, তাহ'লে তার পক্ষে এইভাবে চিত্তশুদ্ধি করা সম্ভব হবে না।

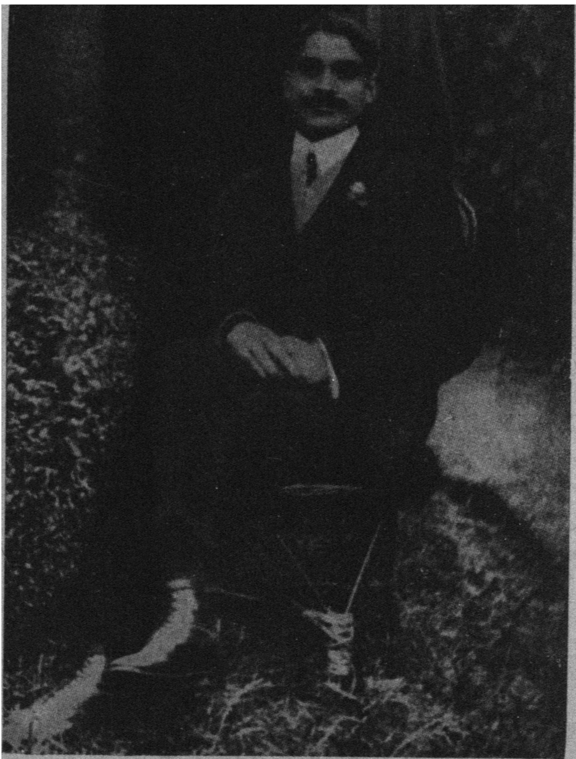
"গান্ধীজীর কাছে তাই 'অহিংসা' ও 'সত্য' প্রায় সমার্থক ছিল। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি বিভিন্ন সময়ে জীবনচর্চার যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজেও তা মেনে চলেছেন। যেমন ধরা যাক খদ্দর পরবার জন্য তাঁর জেদ। যারা বিদেশী কাপড় ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তাদের উপর জোর ক'রে খাদি-ব্যবহারের এই নির্দেশ চাপিয়ে দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিলেন এ হ'লো বিদেশীদের বিরুদ্ধে একটা রাজ-নীতিক অস্ত্র। আসলে কিন্তু খদ্দর ব্যবহার সম্পর্কিত তাঁর জেদের মূলে ছিল এই ধারণা যে, এদেশের লোকের উচিত নয় বিদেশী



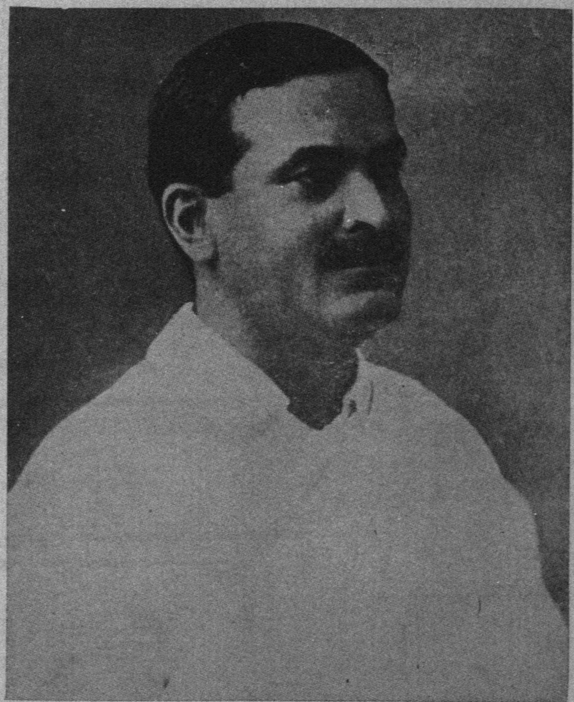
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়



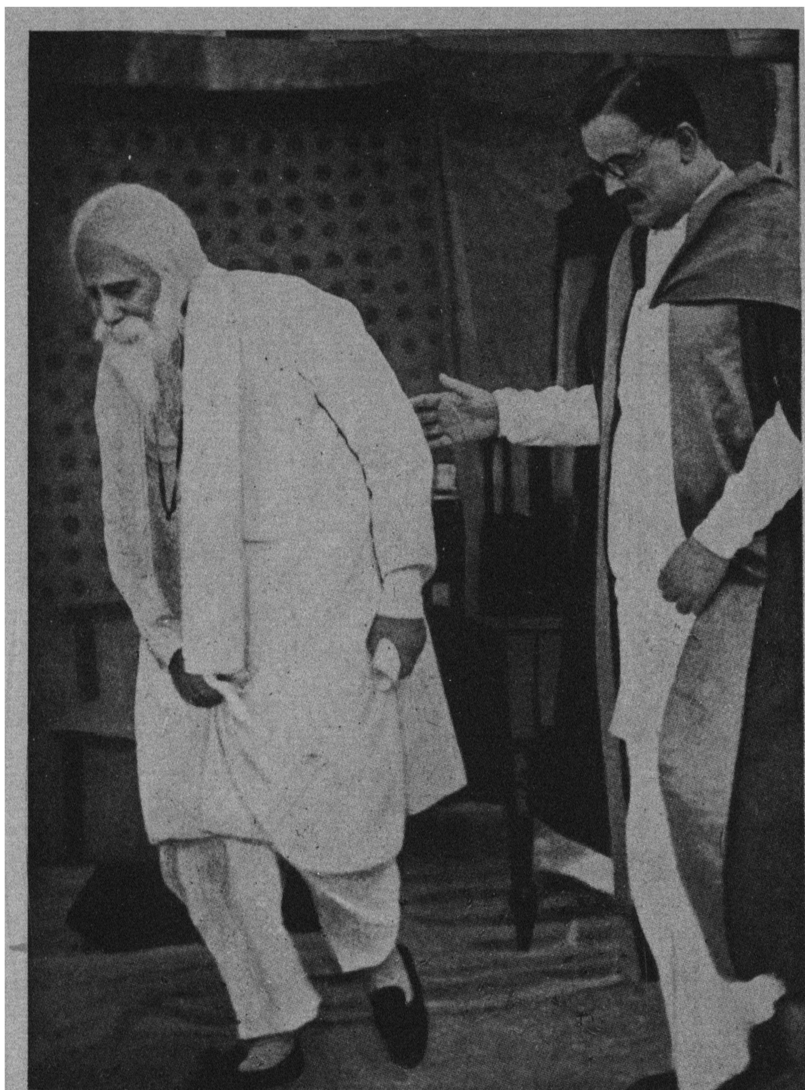
পিতা প্রকাশচন্দ্র ও ভাইয়েদের সঙ্গে বিধানচন্দ্র (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)



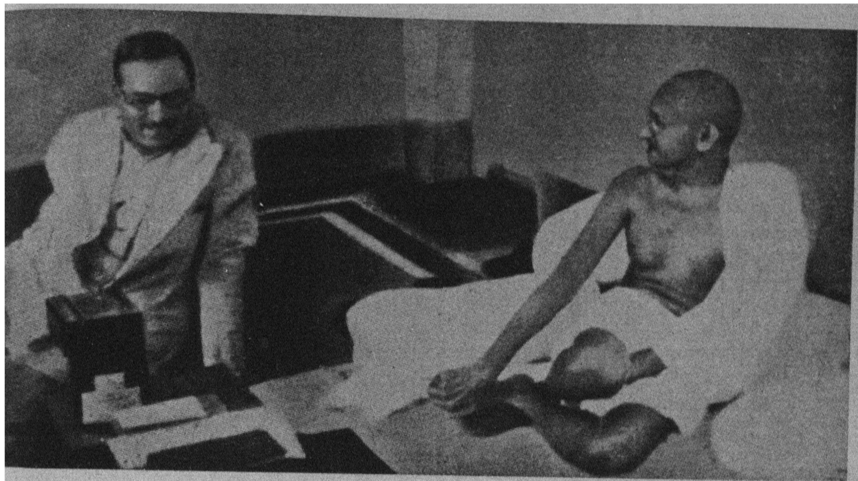
১৯১১ সালে বিলেত থেকে এম. আর. সি. পি. ও এফ্. আর. সি. এস্ পাশ করে ফেরবার পর তরুণ ডাক্তার বিধানচন্দ্র



কলকাতার মেয়র বিধানচন্দ্র

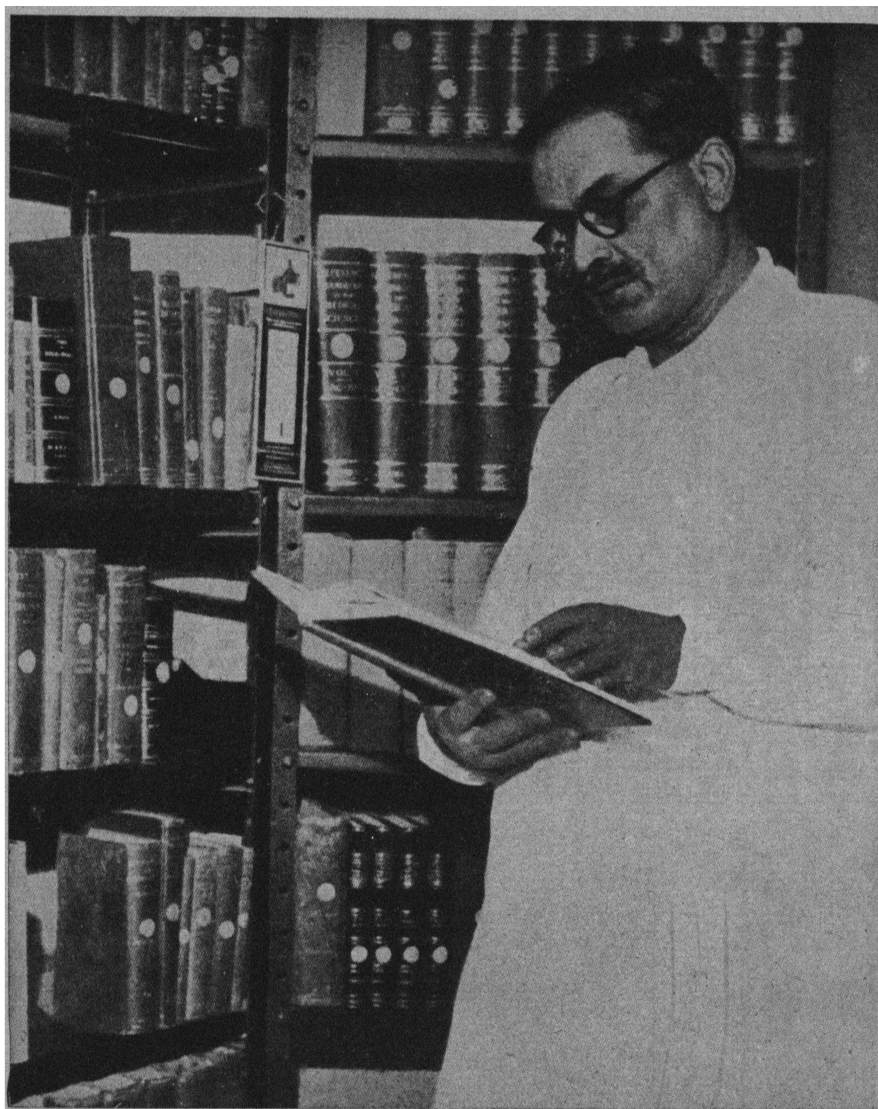


১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে আগত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সভামঞ্চে নিয়ে যাচ্ছেন বিধানচন্দ্র

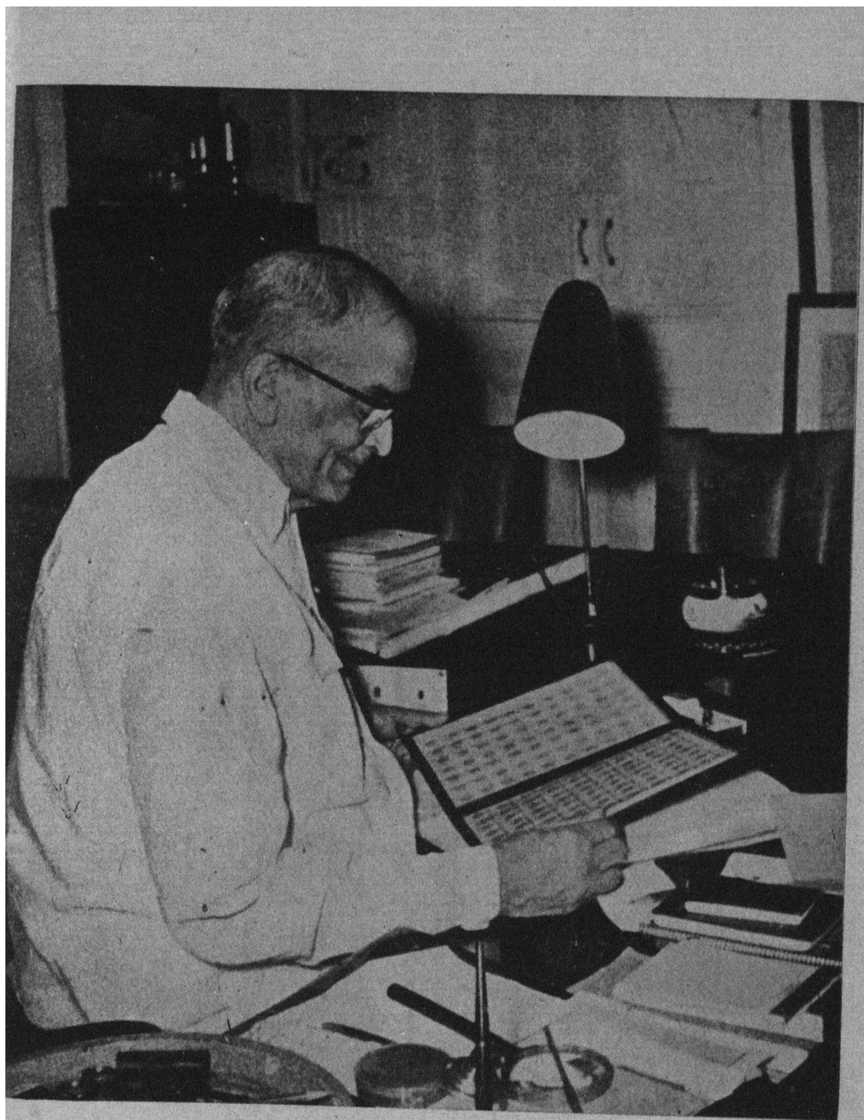


গান্ধীজীর সঙ্গে বিধানচন্দ্র

বিধানচন্দ্রের বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ও মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র



ডাঃ রায় বাড়ির লাইব্রেরীতে



রাইটারস্‌ বিল্ডিংয়ে



বিধানচন্দ্র রায়ের কলকাতার বসতবাড়ি

সাহায্যের উপরে নির্ভর ক'রে থাকা। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেশের লোকেরা নিজেরাই স্বদেশে উৎপাদন ক'রে দেশবাসীকে সরবরাহ করুক—আত্মশক্তিতে আস্থাশীল ও স্বনির্ভর হয়ে উঠুক, খাদি প্রচারের মূলে ছিল সেই উদ্দেশ্য। এটা কোনো সংকীর্ণ বর্জন-কারিত্বের নীতি নয়। সে-ধরনের নীতিতে স্বভাবতই হিংসার মনোভাব থাকে। বিদেশীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবেও গান্ধীজী খাদি ব্যবহারের নীতি উদ্ভাবন করেন নি।

"এ-কথা সকলেই জানে যে, এদেশের কৃষক তার মরস্থমী চাষ-বাসের কাজকর্ম ক'রেও বছরে প্রচুর অবসর পায়। সেই অবসরের সময়ে সে যদি নিজেকে এমন একটা কাজের মধ্যে নিযুক্ত রাখতে পারে যা থেকে তার কাপড়ের ভাবনাটা ঘোচে,—তা'হলে সেই কাজটা তার পক্ষে হবে আশীর্বাদস্বরূপ। কোনো একজন গ্রামবাসী বা তাদের কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলে একটি ক'রে কাপড়ের মিল স্থাপন করা সম্ভব নয়। সেইজন্যই প্রয়োজন তারা যাতে প্রাচীন গ্রাম্য প্রথায়, নিজেদের লজ্জা নিবারণের জন্য, নিজেদের কাপড় তৈরি ক'রে নেবার জন্য চরকায় সুতো কাটে, তাঁতে কাপড় বোনে, সেই ব্যাপারে উৎসাহিত করা। এই উদ্যোগের মূলে ছিল একটি 'সত্য'—তা হ'লো মানুষকে অবশ্যই স্বনির্ভর হ'তে হবে। এই ধরনের কাজকর্ম যেহেতু অহিংসা-মূলক, সেই হেতু এটি একটি সঠিক কর্মপন্থা। মাঝে মাঝে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, জনসাধারণ উৎসাহের আতিশয্যে বিদেশী বস্ত্র-সামগ্রী নষ্ট ক'রেছে বা পুড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু, সে-ধরনের কাজের সঙ্গে গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার নীতিগত কোনো সামঞ্জস্য নেই। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'সাংঘাতিক রকমের ভুল করেছি' (committed a Himalayan blunder) ব'লে তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত ঘোষণা করেছিলেন; তাছাড়া, বর্দোলী ঘটনার পরে পরেই অসহযোগ আন্দোলনও প্রত্যাহার ক'রে নেন। তিনি জানতেন,

অহিংসা ও সত্য থেকে তাঁর পরামর্শাবলী উদ্ভূত হলেও, তাঁর অনুগামীরা তা হৃদয়ংগম ক'রে উঠতে পারেনি, হিংসাকে প্রশ্রয় দিয়ে বিদেশীদের প্রতি ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তুলেছে। কাজেই, এটা স্পষ্ট যে, গান্ধীজী শুধু নীতি প্রচার করেননি, সেই নীতি তিনি তাঁর জীবনে পালনও করেছেন।

"যে-যুগে বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্ররূপে গান্ধীজী অহিংসা ও সত্যের নীতি প্রয়োগের কথা ঘোষণা করেছিলেন, সে-যুগে আমার দেশবাসীর অনেকের মতো আমারও মনে হ'তো গান্ধীজীর ওই নীতি ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা, এদেশের পক্ষে ওই নীতির বাস্তব মূল্য আদৌ আছে কিনা। অন্য অঞ্চলের, অন্য জগতের ক্ষেত্রে হয়তো তা প্রযোজ্য। কিন্তু, ব্রিটিশ সাম্রাজবাদের মতো এমন শক্তিশালী ও সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত শত্রুর সঙ্গে অহিংস অস্ত্রের সাহায্যে লড়াই করা কী ক'রে যে সম্ভব. আমি তার কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি। এদেশের প্রতিরোধশক্তিশূন্য জনগণের পক্ষে কী ক'রে বিদেশীদের বন্দুক-রাইফেলের গুলী ও কামানের গোলার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব? এ-কথা কি সত্য নয় যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য আগে যে-চেষ্টা হয়েছিল, যেমন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ,—তা কি অধিকতর দৈহিক বলসম্পন্ন প্রতিপক্ষ দমন করেনি? কী ক'রে একটি দুর্বল, পুরুষত্বহীন জাতি শক্তিমান্ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে পারে? তাছাড়া, আজকের পৃথিবীতে রাজত্ব করছে অসাধুতা, সত্যের উপর জয়লাভ ক'রে চলেছে অসত্য। এই অবস্থায় নিছক সত্যের ভিত্তিতে মানুষেরা কী ক'রে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারে? কোনো কংগ্রেসকর্মী যদি নিজেকে সত্য ও অহিংসার পূজারীরূপে অভিহিত ক'রে অসাধু উপায়ে কাজ করে, তা হ'লে অহিংসা ও সত্যের একজন অনুগামী হিসেবে নিজেকে ঘোষিত ক'রেও ওই দুটি নীতি নিজের জীবনে ও আচরণে প্রয়োগ না করার দরুন সে কি নিজের ভণ্ডামিই প্রকাশ করবে না? গান্ধীজী যে-সময়ে তাঁর জীবনাদর্শের মৌলিক

নীতি প্রচার করেছিলেন, সেই সময়ের গোড়ার দিকে এই ছিল আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া। কাজেই, এটা স্বাভাবিক যে, যে-কংগ্রেসের পরিচালন-নীতি ছিল এই রকমের, সেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আকৃষ্ট হইনি। আমি মনে করতাম জীবনে ওই দুটি নৈতিক শক্তি লাভ করা সম্ভব নয়।

"সে যাই হোক, ক্রমশ, আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এই মহা-জাগতিক বিশ্বে অহিংসার নীতিই সর্বত্র কাজ ক'রে চলেছে। অহিংসার নীতি ভিন্ন গ্রহনক্ষত্রগুলি কি তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করতে পারতো? তাদের অবস্থানে ও কক্ষ-পরিক্রমায় কোনো হিংসা নেই। প্রত্যেকটি গ্রহ, সবরকমের শক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে, নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে চলেছে। এটা শুধু যে গ্রহনক্ষত্র-জগতের ক্ষেত্রেই সত্য তা নয়, পার্থিব জগতের বস্তুপুঞ্জের ক্ষেত্রেও সত্য। গাছের পাতারা কখনো ভাবে না যে, ডালপালা, শিকড়বাকড় ও ফলফুলের চেয়ে তারাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক। এ-ধরনের কোনো প্রতিযোগিতা থাকলে গাছের কার্যকারিতাই থাকতো না। শক্তিসমূহের মধ্যেই এমন একটা সমন্বয় রয়েছে যার ফলে বীজ একটা বৃক্ষে পরিণত হয় এবং শিকড়, পাতা, ফুল ও ফলের বিকাশ ও বৃদ্ধির ব্যাপারে তাদের নিজ নিজ দাবি সম্পর্কে সেই বৃক্ষই তখন রায় দেয়। বীজ না পুঁতলে গাছ হ'তো না; ফুল না ফুটলে পুষ্পরেণুর অভাবে বৃক্ষ-প্রজাতির সংখ্যা-বৃদ্ধিও ঘটতো না। মানবদেহ সম্পর্কেও আমার ধারণা এই যে, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস বা মস্তিষ্কের মতো দেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টিকে থাকতে বা তাদের কাজ করতে পারতো না, যদি-না একটার সঙ্গে আর-একটার সমন্বয় থাকতো। বস্তুত, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যও দেহের এই ধরনের পারস্পরিক সমন্বয়-সাধনের উপরেই নির্ভরশীল। শারীরিক যন্ত্রপাতির অবনিবনার জন্যই অসুখ করে। দেহের ক্ষেত্রে এই যে সমন্বয়-সাধন, তাও আবার কেবল সম্ভব বিভিন্ন বিষয়ের ক্রিয়া ও

প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে; অর্থাৎ, শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি-নিঃসৃত রসের সাহায্যে। এগুলি একটার সঙ্গে অপরটা এমন নিখুঁত ও সুন্দর-ভাবে সাজানো আছে ব'লে মনে হয় যে, যতদিন পর্যন্ত সেই সমন্বয় থাকবে, মানুষও ততদিন বেঁচে থাকবে। মাঝে মাঝে সমন্বয়ের অভাব ঘটে, সংকট দেখা দেয়। লক্ষ করা গেছে, সেই সংকটের সময়েও মানুষের দৈহিক কাঠামোর মধ্যে যদি এমন কোনো সঞ্চিত শক্তি ও স্থিতি-স্থাপকতা থাকে যা দৈহিক অসমন্বয়ের অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারে, তাহ'লে শারীরিক যন্ত্র আবার স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করে। তবে, এই সমন্বয়ের পথে গুরুতর আকারের কোনো ছেদ ঘটলে জীবন বিপন্ন হ'তে পারে। মানুষের অস্তিত্ব যতদিন, ততদিন ধ'রেই সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে এইরকমের অবিরত সংঘাত। আর, সেই সংঘাত আছে ব'লেই সমগ্র জীবের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, মৃত্যুর পরে কী ঘটে তাই-বা কে জানে? যাকে বলা হয় শারীরিক মৃত্যু,—তার পরেও কি কোনো অভিজ্ঞতা নেই? পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময় সারা জীবন ধ'রে একজনের যে চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতা, তা ব্যক্তি-জীবনের পক্ষে চিরস্থায়ী সম্পদ্। মৃত্যুর পরে আমাদের জীবনের রহস্য ও আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু শতাব্দী ধ'রে বারংবার অনেক আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু এ-বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো মতবাদ গৃহীত হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। কোনো মতবাদই চূড়ান্ত হ'তে পারে না। অভিজ্ঞতা, মতবাদ ও সাধারণ ধারণার মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর, সেই সঙ্গে তার প্রতিটি মানুষের প্রতিনিয়ত বিবর্তন ও বিকাশ ঘটে চলেছে। তথাপি, সুস্পষ্ট একটা সত্য আমি উত্তরোত্তর উপলব্ধি করছি যে, সত্য ও অহিংসার মতবাদ এ-জীবনে এবং পরবর্তী জীবনেও অক্ষুন্ন থাকবে।

"আমার ও গান্ধীজীর পারস্পরিক আকর্ষণের গোপন রহস্য সম্ভবত এই উপলব্ধির মধ্যেই। যে-সব যুক্তির মধ্য দিয়ে আমার এই উপলব্ধি তার সবটাই স্বতোৎসারিত কিনা তা বলতে পারি না। এটা

খুবই সম্ভব,—সম্ভবতই বা বলি কেন, তার চেয়ে স্পষ্ট ক'রেই বলা ভালো যে, আমার মা-বাবার জীবনধারার দৃষ্টান্ত ও তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে এমন গভীর একটা ছাপ রেখে গেছে, যার ফলে গান্ধীবাদ সম্পর্কে আমি এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছি। মা-বাবার কাছ থেকে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছি যে, যা সত্য থেকে জন্ম নেয়, তার বিনাশ নেই। সত্যোদ্ভূত ধারণা ক্রমশই যেন ক্রমবর্ধমান মানস-বৃত্তে বিস্তারলাভ করে। তার প্রভাব ও শক্তি অ্যাটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে অনেক বেশি। দৈহিকভাবে কেউ বেঁচে থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁর সত্যের প্রভাব জনজীবনে বেশি ক'রে বিস্তারলাভ করে। তবে ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুর পরেই যেন তাঁর এই ধরনের চিন্তাধারা ও মতবাদ বৃহত্তর পরিধির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনমানসে যেন আরও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ, তাঁর রক্তমাংসের শারীরিক সীমাবদ্ধতা তখন একেবারেই অন্তর্হিত। আমার মা-বাবা ছিলেন খুবই ধর্মানুরাগী। এ-কথা বলতে আমি এইটাই বোঝাতে চাইছি যে, ভাবাবেগ, কুসংস্কার, উত্তেজনা ইত্যাদি যে-সব লক্ষণ মানবিক দুর্বলতা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে, সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করবার মতো ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সারা জীবন তাঁরা অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ছিলেন। সত্যের প্রতি, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি, তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা ব্যতীত এমনটা সম্ভব ছিল না। তাঁরা যা হয়েছিলেন সর্বশক্তিমান নির্দেশিত প্রার্থনা, ধ্যান ও তপস্যা ভিন্ন তাঁরা তা হ'তে পারতেন না। ঈশ্বরের বিশ্বজগতে ঈশ্বরই অহিংসা ও সত্যের নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই, যে তাঁর ভজনা করে, তাঁকেই তার ভাগ্যবিধাতা ব'লে জানে, সে কী ক'রে অন্য 'পথপ্রদর্শকের' অনুগামী হবে? ধর্মের এই অনুশীলন কোনো সম্প্রদায়, জাতি বা উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের আত্মিক সম্পর্কের যে-বিকাশ ঘটে, তাই তাকে অহিংসা ও সত্যের নীতি অনুসরণ করবার শক্তি জোগায়। আমার জীবনে,

আমি যদি এই সব নীতি অনুসরণে সক্ষম হয়ে থাকি, তাহ'লে তা আমার মা-বাবার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।"৩

বয়সের দিক থেকে বিধানচন্দ্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর চেয়ে বছর সাতেকের বড়ো। তাছাড়া, পণ্ডিত মতিলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে, এলাহাবাদের নেহরু-পরিবারের প্রায় একজনই হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সুবাদেই জওহরলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। আর, সেই ঘনিষ্ঠতা ও পারস্পরিক বন্ধুত্ব অটুট ছিল বিধানচন্দ্রের অন্তিমকাল পর্যন্ত।

তাই, বিধানচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কেমন মানুষ ছিলেন এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিধানচন্দ্র বলেছেন: "নেহরুর পিতৃদেব ছিলেন একজন সুদর্শন পুরুষ —স্পর্শকাতর, স্নেহশীল, কিন্তু সর্বদাই অনমনীয়। জওহরলাল তাঁর চেয়েও সুদর্শন, মাঝে মাঝে তাঁর চেয়েও স্নেহশীল, স্পর্শকাতরতার দিক থেকে আরও বেশি। অপরের প্রতি আচরণে জওহরলাল অধিকতর উদার-প্রকৃতির তো বটেই—ক্ষেত্রবিশেষে অপরের ত্রুটি-বিচ্যুতিও উদারতার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। মানবিক ত্রুটিবিচ্যুতিকে সে স্বাভাবিক ব'লেই গ্রহণ করে, আর সেই কারণে কখনো কখনো তা উপেক্ষা ক'রেও চলে। কিন্তু, যারা বিশ্বাসহীন অথবা যারা সংকল্পচ্যুত ও উদ্যমবিহীন, তাদের সঙ্গে তার কোনো আপস নেই। বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্যদের সর্বদাই সে গ্রহণ করে,—তার নিজের ভাষাতেই বলি,—'ভালো মনে ও সাগ্রহে, এমন কি আমার যাঁরা বিরোধী তাঁদের প্রতি কোনোরকম মন্দ ভাব না নিয়ে।'

"ভাগ্যের বরপুত্র জওহরলাল। কিন্তু, সে বড়ো একাকী। এমন

১, ২, ৩ কে. পি. টমাস রচিত 'ডাঃ বি. সি. রায়' শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থে উল্লিখিত অংশের তর্জমা।

কি যে-জনতা তাকে গভীর ভাবে ভালোবাসে, সেই জনগণের মধ্যেও সে কেমন যেন একা-মানুষ,—জনগণ তাকে গভীরভাবে ভালোবাসলেও সব সময় তাকে বুঝে উঠতে পারে না! জওহরলাল যেহেতু অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা, তাই এমনটা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যে শিক্ষালাভ করলেও, সে প্রাচীন ইউরোপীয় জগতের কেউ নয়—অথচ, কোনো কোনো অনুদার সমালোচক তাই মনে করে তাকে। তার কণ্ঠে কিন্তু প্রাচীনতর এশিয়া ও ভারতবর্ষেরই কণ্ঠস্বর, যে-কণ্ঠস্বর প্রাচীন প্রাচ্য-সভ্যতার—যা একান্তভাবেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও খুব বেশী প্রয়োজনীয়। এই বাক্‌ভঙ্গিমা সে যেন নতুন ক'রে আয়ত্ত করেছে অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার অভিজ্ঞতা থেকে। সেই কারণেই তার কণ্ঠস্বরে যেমন অতীতের গভীরতা, তেমনি আবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ের প্রাণবন্ত আকুলতা।

"যারা তাকে ভালো ক'রে জানে না, বিশেষ ক'রে তাদের কাছে জওহরলাল এক সুকঠিন ব্যক্তিত্ব। এই শ্রেণীর লোকেরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না ক'রেই কখনো কখনো তার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে; কিন্তু তার সঙ্গে একবার কথাবার্তা হ'লে তারাই আবার তার সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছে যায়। এই রহস্যের মূলে আছে তার নিজস্ব একটা বিশেষত্ব,—অর্থাৎ সে একদিকে যেমন অপরের যুক্তি বোঝবার চেষ্টা ক'রে, অন্যদিকে তেমনি সে উদ্যোগী হয় তার নিজের যুক্তি অপরকে বোঝাবার জন্য। প্রধানত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই জওহরলাল প্রতিটি সমস্যা বিচার ক'রে দেখে, আর সেই দেখার মধ্যে থাকে সত্যদৃষ্টি ও ধৈর্যশীলতা। তার সঙ্গে কথা ব'লে তুমি যখন চ'লে আসবে, তখন তোমার মনে হবে বেশির ভাগ যুক্তিতে তুমিই যেন জিতে গেছ; বাস্তবক্ষেত্রে সে কিন্তু জানে, সে-ও তার কোনো যুক্তিতে তোমার কাছে হারে নি। নিজেকে খাপ খাওয়াতে সে ইচ্ছুক, যদিও সে অনমনীয়,—তার সম্বন্ধে সেই ১৯২০ সালে মতিলাল যা বলেছিলেন সেই কথাই ঠিক। মতিলাল বলেছিলেন—'নীতিগত কোনো প্রশ্নে

সে যে আপস করবে এমনটা আমি তার কাছ থেকে চাই না বা আশাও করি না।'

"অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্কেরা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করে, বিশেষত আমি যেহেতু একজন চিকিৎসাবিদ্ সেহেতু তারা জানতে চায় —জওহরলালের অফুরন্ত যৌবনের, তার সদা-প্রফুল্লতার এবং তার সজাগ, সুস্পষ্ট ও বিশ্লেষণী মনোভাবের রহস্যটা কী।

"এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তবে, আমার ধারণা প্রতিটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার আশ্চর্যরকমের একটা ক্ষমতা আছে জওহরলালের। সে যখন ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে থাকে, তখন সে তাদেরই একজন। সে তাদের সঙ্গে খুনসুটি করে, তাদের সঙ্গে খেলে, তাদের সঙ্গে তাদের ছেলেমানুষী ভাষায় কথা বলে এবং তারা যা ভালোবাসে বুঝতে পারে সেই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। যখন আবার তরুণদের সঙ্গে মেশে, তখন সে যেন তার বয়স থেকে পঞ্চাশটা বছর ঝেড়ে ফেলে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে—তখন সে দিব্যি বেড়া ডিঙিয়ে যায়, এমন কি ল্যাম্পপোস্ট বেয়ে ওঠে, তাদের সঙ্গে দৌড়ায়, লাফায়, স্কিপিং করে, —তাদের সঙ্গে মেতে গিয়ে এমনভাবে হো হো ক'রে হাসে যে, মনে হয় যেন সে-ও একজন তরুণ হয়ে গেছে। আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে সে শুধু তাদের মজাদার পোশাকেই নিজেকে সজ্জিত করে না, তাদের সঙ্গে নাচে পর্যন্ত। জনগণের সমাবেশে সে যখন ভাষণ দেয়, সে তখন তাদের সঙ্গে এমন সহজ-মধুর কথোপকথনের ভঙ্গিতে কথা বলে যে, সকল মানুষের মন জয় ক'রে নেয়। কূটনীতিকদের সঙ্গে সে যেমন বিশ্বের গুরুতর সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে, তেমনি রাজনীতিক-দের সঙ্গে রাজনীতিক বিষয়, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সর্বাধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রসঙ্গ, শিল্পপতিদের সঙ্গে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি এবং মহিলাদের সঙ্গে ঘরকন্নার বিষয় নিয়ে চলে তার আলোচনা। সব জায়গায় সব মানানসই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ডাক্তারদের সঙ্গে

কথা বলতে গিয়ে সে সব সময় বলে যে, ওষুধপত্র, ভেষজ শিকড়বাকড়, বড়ি ইত্যাদি সে খুব কমই চেনে, কেননা ওষুধ সে কদাচিৎ খায়। লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে জওহরলালের কোনো ক্লান্তি নেই। কাজেই, সব সময় সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। সে যখন যেখানে যায়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় তার যৌবন ও আনন্দের দ্যুতি, এবং সেই দ্যুতি সংক্রামিত করে অপরের মধ্যে। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন যে, নেহরু হ'লো 'এমন একজন মানুষ যে তার কীর্তির চেয়েও বড়ো এবং তার পরিমণ্ডলের চেয়ে অধিকতর সত্য।'

"সম্ভবত কোনো এক দার্শনিক একসময় বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীর বেশির ভাগ অনিষ্টের কারণ হ'লো—যা আমাদের বহু আগেই ভুলে যাওয়া উচিত ছিল তা মনে রাখি ব'লে এবং যা আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত তা ভুলে যাই ব'লে। মানুষের মনও কম বিচিত্র নয় :— যা গুরুত্বপূর্ণ তা মনে রাখার মতো ধারণশক্তি এর নেই অথচ প্রয়োজনমাফিক অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার দিব্যি ভুলে যায়। স্মৃতিশক্তি যেন এক সারি পায়রার খোপ,—সেখানে অভিজ্ঞতাগুলি একের পর এক জমে উঠছে। মনটাকে যদি এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় যে, একবারে সে একটি মাত্র পায়রার খোপ খুলবে, তা হ'লে মানুষ বিষয়সমূহে মনঃসংযোগ করতে পারে, সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারে, এবং মনোগত যে-রকম বিশৃঙ্খলার জন্য বেশির ভাগ মানুষকে ভুগতে হয়, তা পরিহার করতে পারে। এক সময়ে মাত্র একটি বিষয়ে স্মৃতিকে আকর্ষণ ক'রে রাখার শক্তি কোনো যৌগিক প্রক্রিয়া নয়, তা হ'লো সুকঠিন অভ্যাসের ফল। তুমি যখন শরীর আল্‌গা ক'রে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে চাও, দুশ্চিন্তা ভুলতে চাও তখন তোমাকে স্মৃতির ওই পায়রার খোপগুলিকে বন্ধ ক'রে রাখতে হবে। তা হ'লেই তুমি তখন সুখী। আমার ধারণা, ঠিক এইভাবেই জওহরলালের মন কাজ করে। সে মনঃসংযোগ করতে পারে তবু মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে না বা কোনো বিষয় নিয়ে একটা চিন্তা ক'রে

নিজেকে অসুখী ক'রে তোলে না। হাজার হাজার সমস্যা নিয়ে তার কারবার, প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর সে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে; তথাপি সে কখনো ক্লান্ত হয় না, কোনো সহানুভূতিও চায় না। এই হ'লো তার প্রাণশক্তি, যৌবন ও উচ্ছল উদ্দীপনার গোপন রহস্য।

"বর্তমানে জওহরলাল রাষ্ট্র-জাহাজের প্রধান কর্ণধাররূপে বিরাট বোঝা বহন করছে। প্রসঙ্গত সে নিজেই একবার বলেছে, 'আজকের ভারতে কাউকে কঠিনতম শাস্তি দিতে হ'লে তাকে কোনো কর্তৃত্বের গদিতে বসিয়ে দাও।'—১৯২৯ সালে জওহরলাল কংগ্রেস-সভাপতি হ'লে গান্ধীজী যে-কথা বলেছিলেন তা তখনকার মতো এখনও প্রযোজ্য, 'এ সম্মান কখনো গোলাপের মুকুট ছিল না; এখন তা কণ্টকপূর্ণ হয়েই দেখা দিক।'

"সেই উপলক্ষে তার গৌরব ও বেদনার অংশ গ্রহণ ক'রে সরোজিনী নাইডু তাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'এ হ'লো তোমার অভিষেক ও শূলদণ্ড—আসলে এই উভয় অবস্থাই অবিচ্ছিন্ন এবং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে ও অবস্থায় প্রায় সমার্থক; বর্তমানে সমার্থক তো বটেই, বিশেষ ক'রে তোমার ক্ষেত্রে।'—এর চেয়ে ভালো ক'রে আমি আমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি না।"[৪]

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বয়সে প্রায় পনেরো বছরের বড়ো ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র। সেদিক থেকে সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর প্রীতিভাজন রাজনীতিক-সহকর্মী। তাঁরা উভয়েই দেশসেবার দীক্ষামন্ত্র পেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে। সুভাষচন্দ্র যখন 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' থেকে পদত্যাগ ক'রে, দেশবন্ধুর কাছে গিয়ে

৪ বোম্বাইর 'টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়া'-র ১৯৫৯-র নভেম্বরে প্রকাশিত রফিক জ্যাকেরিয়ার 'এ স্টাডি অব নেহরু' শীর্ষক রচনা থেকে গৃহীত ও অনূদিত।

দাঁড়ান, তখন সুভাষচন্দ্রের বয়স ২৩ কি ২৪ বছর। সেই সময় থেকে তাঁর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসবার ঘটনা পর্যন্ত, বহু কার্যকলাপের সঙ্গে বিধানচন্দ্রের ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে তিনি দেখেছেন খুবই নিকট সান্নিধ্যে, আর নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ করেছেন বহু দূর থেকে। এই দুই দৃষ্টিপথেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন বিধানচন্দ্রের অতি প্রিয় 'সুভাষ'।

"…সুভাষ আজ কেবলমাত্র সুভাষ নহেন, তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে অনুরাগ ও শ্রদ্ধাভরে 'নেতাজী' আখ্যা দিয়াছে। কিন্তু আমি আজও তাঁহাকে সুভাষ বলিয়া ডাকিতেই ভালোবাসি। এই নামেই আমি তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হইয়াছিলাম এবং আজও এই নামেই তাঁহাকে ডাকিতে আনন্দ অনুভব করি।"—এই অনুভূতিবশেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মদিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বেতার মারফত ওই কথাগুলি বলেছেন বিধানচন্দ্র। সেই বেতারভাষণে তিনি আরও বলেছেন: "সুভাষ আজ একটি ব্যক্তি-বিশেষ মাত্র নহেন—তিনি একটি বিশুদ্ধ ও মহান আদর্শের প্রতীক। তাঁহার জীবন ও প্রত্যেক কার্যকলাপকে আমরা খণ্ডখণ্ডভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারি না। এক মূল ধারার ভিতর দিয়া প্রবাহিত তাঁহার সমগ্র জীবন আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তাঁহার স্থান আজ নাম, সম্প্রদায়, নগর, সমাজ অথবা দেশ সবকিছুর ঊর্ধ্বে।"

দেশের মঙ্গলের জন্য 'ভগবানের বাণীবাহক' সুভাষচন্দ্রের সর্বস্ব ত্যাগ—এই বৈশিষ্ট্যটিই বিধানচন্দ্রের কাছে সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই কথাই তিনি তাঁর বেতারভাষণে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখও করেছেন: "ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিভিন্ন প্রেরিত-পুরুষ ও অবতার বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তথাপি একটি বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। তাহা হইতেছে এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের

যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি যথাসর্বস্ব ত্যাগ না করেন, তবে জনচিত্ত তাঁহারা কী প্রকারে জয় করিবেন? কোনো ব্যক্তি যদি নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিতে না পারেন, তবে কী প্রকারে তিনি ভগবানের দূত হইতে পারেন? তিনি যদি আত্মত্যাগ না করিতে পারেন, তবে কী প্রকারে তিনি অন্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন? সুভাষের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য তাঁহার তরুণ বয়সেই মূর্ত হইয়াছিল। এইজন্যই তিনি তাঁহার অন্তরতম সত্তার তৃপ্তির জন্য হিমালয়ে যাইতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ত্যাগের মহিমাই তাঁহাকে ঐশ্বর্যবিমুখ করিয়াছিল, যাহাতে ভোগবিলাস তাঁহার জীবন আচ্ছন্ন করিতে না পারে। সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সুভাষ চিত্তরঞ্জন দাশের শিষ্য হইতে পারিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের সহিত সুভাষও বলিতে পারিয়াছিলেন, যে নিজের স্বার্থ ষোলো আনা বজায় রাখিতে চাহে, পরের স্বার্থরক্ষা করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে বৃথা। ইহাই ছিল সুভাষের জীবনের বাণী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের মতো সুভাষও দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

নেতাজীর 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি-মন্ত্রের অত্যাশ্চর্য শক্তিতে বিস্ময়বিমুগ্ধ-চিত্ত বিধানচন্দ্র বলেছেন: "বাঙালীদের প্রতি অভিযোগ করা হয়, আমরা কলহপ্রবণ, আমরা একে অন্যের উপর দোষারোপ করি, আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, আমরা এমন কি পরশ্রীকাতর। সুভাষ তাঁহার জীবন ও আচরণ দ্বারা এই প্রকার অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'জয় হিন্দ্' এই একটি মাত্র মন্ত্রের শক্তিতে সমস্ত ধর্ম, সমস্ত সম্প্রদায় ও সমস্ত প্রদেশের লোক একত্র হইয়াছিল।"

এ-কথা সকলেই জানেন যে, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত কলকাতার 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে হঠাৎ অন্তর্ধান করবার

পরেও কিছুদিন পর্যন্ত 'মহাজাতি সদন' নির্মাণ কাজ চলেছিল। তার পরেই একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। ভারত থেকে অন্তর্ধানের সময়ে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে একটি মামলা চলছিল। সেই মামলার সূত্রে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নির্মীয়মাণ 'মহাজাতি সদন'-ভবনটি ক্রোক ক'রে নেন। তখন সেই ক্রোক-এর আদেশ প্রত্যাহার করবার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করেন সুভাষ-অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু ও অ্যাটর্নী নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। তাঁরা তাঁদের আবেদনে বলেন যে, 'মহাজাতি সদন'-সম্পত্তির সঙ্গে সুভাষ-চন্দ্রের কোনো স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না,—কাজেই ক্রোক-এর আদেশ প্রত্যাহার করা হোক। তখনও ব্রিটিশ রাজত্ব চলেছে। কাজেই, ব্রিটিশ-শাসন-বিরোধী অন্তর্হিত জননায়ক সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নকে সার্থক ক'রে তোলার কাজে অন্তরায় ঘটাতে তৎপর হলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তিনি সেই ক্রোক-এর আদেশ প্রত্যাহার করলেন না— সদন-ভবনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য 'রিসিভার' নিযুক্ত করলেন কলকাতা করপোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারকে। কলকাতা হাইকোর্টেও একটি মামলা রুজু করা হ'লো বটে, কিন্তু ভবন-নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখতে হ'লো।

দেশ স্বাধীন হবার পর, ডাক্তার বিধানচন্দ্র যখন মুখ্যমন্ত্রী হন, তখন সুভাষচন্দ্রের 'মহাজাতি সদন'-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য যে-আগ্রহ দেখান ও যে-উদ্যোগ নেন, সে-কথা দেশবাসী নিশ্চয়ই সকৃতজ্ঞচিত্তে চিরদিন মনে রাখবে। ১৯৪৮ সালের ৩০ জুন কলকাতা হাইকোর্ট 'মহাজাতি-সদন ক্রোক'-এর মামলায় রায় দিতে গিয়ে ঘোষণা করলেন—'মহাজাতি-সদন'-সম্পত্তি জনগণের কল্যাণার্থে ব'লে তা ক্রোক করা যেতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র তখন অনুভব করলেন যে, অসমাপ্ত 'মহাজাতি সদন'-এর নির্মাণ-কাজের দায়িত্ব এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই গ্রহণ করা উচিত। তাঁর পরি-

কল্পনা মতো কাজ শুরু হ'লো। বিধানচন্দ্রের সেই কর্মোদ্যোগে সহযোগী হলেন তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় এবং বিচার ও আইন মন্ত্রী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। তাঁরা তিনজনেই উপলব্ধি করেন যে, 'মহাজাতি সদন'-এর নির্মাণ-কাজ শেষ হ'লে, সুভাষচন্দ্রের মূল আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য সফল ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে একটি 'অছি পরিষদ' বা ট্রাস্টী বোর্ড গঠন ক'রে তাঁদের হাতেই এর ভার তুলে দেওয়া সঙ্গত। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের ২৪ জানুয়ারি নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে 'মহাজাতি সদন বিল' নামে একটি বিল উত্থাপন করেন। সেই বছর ১৪ এপ্রিল তা আইনে পরিণত হয়। সেই আইন মোতাবেক গঠিত হয় এক 'অছি পরিষদ'।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবার ঠিক উনিশ বছর পরে, ১৯৫৮ সালের ১৯ আগস্ট, ডাক্তার বিধানচন্দ্র এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত 'মহাজাতি সদন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন একটি পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে এবং একটি স্মারক-ফলক স্থাপন ক'রে। বিধানচন্দ্র সেদিন তাঁর ভাষণে 'মহাজাতি সদন' স্থাপনের জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার কথা এবং কবিগুরুর অনেক কবিতাংশ ও নেতাজীর বাণী উদ্ধৃত করেন। প্রসঙ্গত বলেন: "এই 'মহাজাতি সদন' যাঁরা স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা আমাদের উপর একটি মহান্ জাতি গঠনের ভার অর্পণ ক'রে গিয়েছেন। আমরা কি সে-ভার গ্রহণের উপযুক্ত? আমাদের সম্বল কেবল আমাদের জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। অতীতের কীর্তিই আমাদের অবলম্বন। কিন্তু সকল মহান্ কর্মেই চাই নিয়মানুবর্তিতা। বাঙালী স্বভাবতই ভাবপ্রবণ এবং সেই ভাবাবেগের দ্বারা তাঁরা কখনও কখনও অসাধ্য সাধনও করতে পারেন। কিন্তু এই ভাবাবেগ যদি নিয়ন্ত্রিতভাবে কার্যকরী না হয়, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যদি আমরা কাজ করতে না পারি, তবে পাহাড়ী নদী যেমন বাঁধ ভেঙে কূল ছাপিয়ে উঠে চারিদিকের গাছপালা, বাড়িঘর, মানুষ সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং মহাজলপ্লাবন সৃষ্টি

করে, জাতির মধ্যে অসংযত উত্তেজনা তেমনি আমাদের সহায়হীন ক'রে, দুর্বল ক'রে তুলবে।" এই সত্যভাষণ ক'রে বিধানচন্দ্র তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলেন: "এই গৃহ হোক সমগ্র জনসমাজের সকল শুভকর্মের প্রাণকেন্দ্র। তাঁরা যেন এখানে ভারতের মনুষ্যত্ব এবং জাতীয়তার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য জ্ঞান ও আলোক খুঁজে পান। তাহ'লেই এর 'মহাজাতি সদন' নাম হবে সার্থক।"

৭

১৯৪৮ থেকে ১৯৬২, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সাড়ে চোদ্দ বছর একটানা ডাক্তার রায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কর্মবহুল জীবনের মধ্যে এই সাড়ে চোদ্দ বছর তাঁর দিক থেকে যেমন একটি উজ্জ্বল অধ্যায়, তেমনি উজ্জ্বল স্বাধীনোত্তর নবজাত ও সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে।

স্বাধীনতা-লাভের সময় বিধানচন্দ্র ভারতে অনুপস্থিত। নিজের চোখের চিকিৎসা করাবার জন্য সে-সময় তিনি আমেরিকায়। তখন উত্তর-প্রদেশের ভাবী রাজ্যপাল হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হ'লো রাজধানী দিল্লী থেকে। কিন্তু, নিজের কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ ক'রে, অন্যত্র নিছক শোভাবর্ধক কোনো উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হ'তে আদৌ তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। কেননা, তাঁর বয়স তখন ৬৫ বছর হ'লেও, সে-বয়সেও প্রাণ-প্রাচুর্যে ও কর্মক্ষমতায় তিনি ছিলেন যে-কোনো তরুণের সমকক্ষ বা ঈর্ষার পাত্র। 'যতক্ষণ বেঁচে আছি, কাজ করবার ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ দেশের জন্য, দশের জন্য কাজ ক'রে যাব'—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাস। বিধানচন্দ্র তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। একদিন তিনি একটা জরুরী টেলিফোন পেলেন দিল্লী থেকে। ভারতের মধ্যবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল টেলিফোন ক'রে তাঁকে বললেন: বিধান, ইউ-পি'র গভর্নর করা হচ্ছে তোমাকে,—তোমার সম্মতি চাই।

আমেরিকার প্রান্ত থেকে জবাব দিলেন ডাক্তার রায়ঃ না, না,—ও-কাজ আমার নয়। তবে, নেহাতই যদি খুব বেশি জরুরী মনে করো, তাহ'লে মাস পাঁচেকের জন্য রাজী হ'তে পারি। কিন্তু, সেপ্টেম্বরের আগে তো দেশে ফিরতে পারছি না। যাঁর কাছে আমি চোখের চিকিৎসা করাতে এসেছি, তিনি তো বলছেন সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আমাকে এখানেই থাকতে হবে।

সে যাই হোক, ইউ-পি'র গভর্নর হিসাবেই ডাক্তার বিধানচন্দ্রের নিয়োগ-প্রস্তাব প্রশাসনিক রীতি অনুসারে ব্রিটিশ-রাজের অনুমোদন লাভ ক'রে এলো, এবং সরকারি গেজেটেও তা ছাপা হয়ে গেল। ওদিকে দেশে ফিরতে আরও দু' মাস দেরি হয়ে গেল ডাক্তার রায়ের। তিনি ফিরলেন নভেম্বর মাসের পয়লা তারিখে। ইতিমধ্যে অস্থায়ী-ভাবে ইউ-পি'র রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন সরোজিনী নাইডু। তাতে ডাক্তার রায় খুশীই হলেন এবং শ্রীমতী নাইডুকেই পাকাপাকিভাবে যাতে রাখা হয়, সেই কথা প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে জানাবার জন্য দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন।

স্বাধীনতা-লাভের সময় নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সে-সময় এই রাজ্যে ছিল দ্বি-স্তর আইন-সভা—অর্থাৎ, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে গঠিত বিধানসভা বা লেজিসলেটিভ্ অ্যাসেম্বলী, আর পরোক্ষ নির্বাচনে গঠিত বিধান-পরিষদ বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন-কেন্দ্র' থেকে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের বিধান-পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হ'লেন।

তারপর, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধী যখন দিল্লীতে অনশনরত, সেই সময় তাঁকে দেখতে গেলেন ডাক্তার রায়। গান্ধীজী সেই সময় তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার দায়িত্ব নিতে বললেন। কারণ, তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর ঘোষ ইতিমধ্যে পদত্যাগ-পত্র পেশ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার সদস্যরাও বিধানচন্দ্রকেই তাঁদের দলপতিরূপে নির্বাচিত করলেন। ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন ডাক্তার রায়। আর, সেই থেকে ১৯৬২ সালের ১ জুলাই, জীবনের অস্তিমলগ্ন পর্যন্ত সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। 'আর এই মুখ্যমন্ত্রীরূপেই যেন কর্মযোগী মানুষটি তাঁর সর্বোত্তম মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছেন।'—এ-কথা যেমন বলেছেন সাংবাদিক শ্রীঅশোককুমার সরকার, তেমনি মুখ্যমন্ত্রীরূপে বিধানচন্দ্রের অশেষ-গুণমুগ্ধ শিক্ষাবিদ্ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন—"তখনকার ভারতবর্ষে আর কোনো রাজ্যেই পশ্চিম-বাংলার মতো এত সমস্যা ও প্রতিকূলতা ছিল না, অথচ এখানেই বিধানচন্দ্রের সংগঠনপ্রতিভা প্রকাশিত হয়েছিল উজ্জ্বলতম আভায়। বস্তুত, তখনকার রাজ্যনায়কদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শিরোমণিস্বরূপ। …ব্যক্তিগতভাবে তিনি বহু মুমূর্ষু রোগীকে প্রায়-নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু পশ্চিম-বাংলাকে তিনি যে সমষ্টিগত মৃত্যুসংকট থেকে রক্ষা ক'রে গেলেন, এই কৃতিত্বই তাঁকে আমাদের ইতিহাসে অমর ক'রে রাখবে।"

বিধানচন্দ্র যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সময়টা আদৌ অনুকূল ছিল না। প্রথমত সদ্য দেশ বিভক্ত হয়েছে, পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নরনারীর স্রোতে পশ্চিমবঙ্গ তখন উদ্বেল। দ্বিতীয়ত মুসলিম লীগ দলের শাসনকালে যে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' (১৩৫০ বঙ্গাব্দের বা ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ) হয়েছিল, তার জের তখনো চলেছে। তৃতীয়ত ১৯৪৬-সালে লীগের 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের মনে যে গভীর আঘাত হেনেছিল, সে-ক্ষতও পুরোপুরি শুকোয় নি। তার উপরে স্বাধীনতা-লাভের পর ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে যে প্রথম কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা কাজ শুরু করেছিল তারও সদ্য পতন ঘটেছে। তাছাড়া, আরও বহুবিধ সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ তখন জর্জরিত। সেই

সমস্যাসঙ্কুল পটভূমিকায় বিধানচন্দ্র এসে পশ্চিমবঙ্গের হাল ধরলেন। সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর ভাষায়—"এই বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু পুরুষ যদি ভাঙা বাংলার দায়িত্ব গ্রহণ না করতেন তবে এ দেশের কী অবস্থা হ'তো ভাবতেও আতঙ্ক হয়।" সেই একই সুরে পরবর্তীকালের অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছেন: "ডাক্তার রায়ের মতো প্রতিভাধর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন মুখ্যমন্ত্রী না পেলে পশ্চিম-বাংলার কী অবস্থা হ'তো তা জানা নেই।"

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বিধানচন্দ্রকে যে-বিরাট মানবিক ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়, তা হ'লো পশ্চিমবঙ্গে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারীর সাহায্য ও পুনর্বাসনের সমস্যা। গভীর মমতায় একটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সেই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ব'লেই সেই সমস্যার দ্রুত মোকাবিলাও করেছিলেন। উদ্বাস্তু সমস্যার দ্রুত ও স্থায়ী সমাধানের জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। উদ্বাস্তু যুবকদের বিদ্যালয়গত ও বৃত্তিগত শিক্ষা-দান, উদ্বাস্তু কৃষিজীবী তথা মৎস্যজীবীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে পুনর্বাসন, কুটিরশিল্পী ও অন্যান্য পেশার উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যাপক সাহায্য দান, নিঃসহায় উদ্বাস্তু নারী ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থাও তাঁরই পরিকল্পনা মতো করেছেন তাঁর সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুটি কৃষি-কল্যাণমূলক প্রকল্প হ'লো ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী সেচ-ব্যবস্থা। খরা ও প্লাবনের হাত থেকে এই রাজ্যের কৃষিকে বাঁচাবার জন্য এই দুটি সেচ-ব্যবস্থার প্রচলন হয়। পনেরো কোটি টাকার ময়ূরাক্ষী প্রকল্পটি বিধানচন্দ্র পরিচালিত সরকারের পক্ষে নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় কীর্তি। ভারতের নদী-উপত্যকা-প্রকল্পের অন্যতম ময়ূরাক্ষী জলাধার-বাঁধ দেশীয় এঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের ছয় মাস আগেই নির্মিত হয়ে এক রেকর্ড সৃষ্টি করে। এই বাঁধের জলে কৃষি-সেচের ব্যবস্থা ক'রে ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন ক'রে রাজ্যের কৃষিভিত্তিক

আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন এবং গ্রামীণ শিল্প সংক্রান্ত অবস্থার অগ্রগতি বৃদ্ধি করাই ছিল বিধানচন্দ্রের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে কংসাবতী সেচ-প্রকল্পের বাস্তব-রূপায়ণের কথাও স্মরণীয়। দামোদর-উপত্যকা প্রকল্পটি যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের, তথাপি এ-কথা সকলেই জানেন যে, সেই কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের হাত ছিল অনেকখানি।

সোনারপুর-আড়াপাঁচ অঞ্চল থেকে বদ্ধ জল নিকাশ ক'রে এক বিস্তীর্ণ এলাকা তিনি শস্যচাষের উপযোগী ক'রে তোলেন। 'সোনারপুর-আড়াপাঁচ জলনিকাশী পরিকল্পনা'-র মতো একটি বৃহৎ পরিকল্পনা তাঁর সময় শুধু প্রথম-ই নয়, এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম কৃষি-কল্যাণসূচক পরিকল্পনা হিসাবেও স্বীকৃতিলাভ করেছে। সেই পরিকল্পনা কার্যকর হ'লে দেখা যায় চব্বিশ-পরগনা জেলার সোনারপুর অঞ্চলের জলাবদ্ধ সুবিস্তীর্ণ এলাকা অপর্যাপ্ত সোনালী ধানের শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই সাফল্য বিধানচন্দ্রের দূরদর্শিতা ও সংগঠন-শক্তিরই সাফল্য।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক নবরূপায়ণে 'দুর্গাপুর পরিকল্পনা' মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক অতুলনীয় কীর্তি ব'লেই চিহ্নিত হয়ে আছে। একদা যে-দুর্গাপুর ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, দিনের বেলাতেও যে-অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করতে সাধারণ মানুষ ভয় পেতো, যে-অঞ্চলে ছিল জন্তু-জানোয়ার ও ডাকাতের উপদ্রব—সেই অঞ্চলই পরে হ'লো রূপকার বিধানচন্দ্রের উদ্যোগে এক বিরাট 'শিল্প-নগরী'। প্রকৃতপক্ষে বিধানচন্দ্রকে 'দুর্গাপুরের স্রষ্টিকর্তা' বললেও কোনো অত্যুক্তি হয় না। দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তিনি শুধু 'কোক-চুল্লী' স্থাপন ক'রেই ক্ষান্ত হন নি—বলতে গেলে তাঁরই ব্যক্তিগত প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারত-সরকারের অন্যতম সুবৃহৎ ইস্পাত-কারখানা। আরও অনেক রকমের শিল্প-কারখানা গ'ড়ে উঠেছে দুর্গাপুরে এবং হাজার হাজার বেকার যুবকের কর্মসংস্থান

হয়েছে। এ-সবই সম্ভব হয়েছে বিধানচন্দ্রের দূরদর্শিতায়।

পরিকল্পনা অনুসারে কোনো কাজে যাতে অহেতুক কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়, সেজন্য ডাক্তার রায় ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করতেন। বলা বাহুল্য, এ-রকম ব্যক্তিত্ব সবার থাকে না, তাঁর ছিল। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন উন্নয়ন-কমিশনার শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়: "এখন দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার তিন শরিক আছে, —কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার বড়ো শরিক। 'দামোদর ভ্যালি অ্যাক্ট' অনুসারে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ঘোষিত এলাকায় করপোরেশন (অর্থাৎ, ডি. ভি. সি.) ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপনের অধিকার" নেই। কিন্তু ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুর্গাপুর প্রোজেক্টস'-এর অঙ্গ হিসাবে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায়, দুর্গাপুরে দুটি তাপবিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র স্থাপনের জন্য এক প্রস্তাব দেন। 'অ্যাক্ট' অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর সেই প্রস্তাব অনুমোদন করতে অনিচ্ছুক হলেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "ওদিকে ডাঃ রায় তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই এ-বিষয়ে মীমাংসার জন্য পরিকল্পনা-কমিশন একটা সভা ডাকলেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্পর্কিত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে গুলজারিলাল নন্দ সভা পরিচালনা করছিলেন। ডাঃ রায়কে যখন তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করতে বলা হ'লো, তিনি যুক্তিসহ তাঁর প্রস্তাবটি স্থাপন করলেন। সভাপতি কিন্তু তাতে কর্ণপাত করলেন না, তিনি সোজাসুজি ডাঃ রায়কে তাঁর প্রস্তাব তুলে নিতে বললেন। উত্তরে ডাঃ রায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত শুধু বললেন—'I want the two thermal stations to be there and I don't like that any body should interfere.' ('আমি চাই, ওখানে দুটি থারমাল

স্টেশন হোক, আর এ-ব্যাপারে কেউ বাধা দিক আমি তা পছন্দ করি না।') তারপর আর আলোচনার কিছু রইলো না। প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়ে গেল।"

শিল্পের উন্নতির জন্য বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে ডাঃ রায় এইভাবে শুধু কেন্দ্রের উপরে চাপ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর নিজের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়ে দুর্গাপুরে, ব্যাণ্ডেলে, ম্যাসাঞ্জোরে ও জলঢাকায় তাপ-বিদ্যুৎ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা গ'ড়ে তুলেছেন। কলকাতা শহর থেকে জনসংখ্যার চাপ কমাবার উদ্দেশ্যে ডাঃ রায়ই একদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে, শহরতলীর মানুষদের চলাচল-ব্যবস্থা দ্রুত ও সুবিধাজনক ক'রে তুলতে, বৈদ্যুতিক রেল-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-পরিবহনও মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের এক গঠন-মূলক প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ ক'রে কলকাতায়, সে-সময় পরিবহন-ব্যবস্থা ক্রমশই অবাঙালীদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল। সেই অবস্থায় 'রাজ্য পরিবহন করপোরেশন' সৃষ্টি ক'রে ডাঃ রায় শুধু যে বাঙালী ছেলেদের কর্মসংস্থান ক'রে দিয়েছেন তা নয়, এতে ক'রে বহু উদ্বাস্তু পরিবারের আর্থিক পুনর্বাসনও হয়েছে।

বিধানচন্দ্র ছিলেন মূলত একজন রোগ-নিরূপক ও রোগ-নিরাময়-কারী চিকিৎসক। তিনি জানতেন বাঙালী শিশুদের পুষ্টির জন্য প্রচুর দুধের প্রয়োজন। কিন্তু সে-দুধ কই, ভালো গো-মহিষই বা এ-রাজ্যে কোথায়? সেই চিন্তা থেকে জন্ম নেয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্রের 'হরিণঘাটা প্রকল্প'। সেই প্রকল্প অনুসারে নদীয়া জেলার হরিণঘাটায়, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে স্থাপিত হয় 'হরিণঘাটা দুগ্ধ-উপনিবেশ'। সেখানে একদিকে যেমন বৃহত্তর কলকাতার জন্য দুগ্ধ-উৎপাদনের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা হয়, তেমনি চলতে থাকে গবাদি পশুর উন্নয়ন, প্রাণিজ বিষয়ে গবেষণা ইত্যাদির কাজ। দূরদর্শী বিধানচন্দ্র যদি-না সেই সময় সরকারি ব্যবস্থায় এইভাবে শহর কলকাতায় দুধ সরবরাহের

ব্যবস্থা করতেন, তাহ'লে অনেকের বিশ্বাস, দুধ শুধু দুষ্প্রাপ্যই হ'তো না, তার দামও হ'তো সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে।

১৯৪৯ সালে ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস এবং ইউরোপের আরও কয়েকটি সমুদ্রলাঞ্ছিত দেশ পরিদর্শনের ফলে, বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র। তারই ফলে রচিত হয় 'গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার' প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে, তিনি বঙ্গোপসাগরের গভীর জল থেকে মাছ ধরবার যে-প্রকল্প রূপায়ণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তা নানাবিধ প্রতিকূল কারণে সফলতা লাভ করে নি। কিন্তু যে-উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সেই অসমসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল বাঙালী ছেলেদের গভীর সমুদ্রে মৎস্য-শিকারে পাঠিয়ে তাদের মনে একটা অভিযাত্রিকের মনোভাব গ'ড়ে তোলা, সেই সঙ্গে তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বঙ্গোপসাগরে ব্যবসায় ভিত্তিক মৎস্য-শিকার প্রবর্তন ক'রে পশ্চিমবঙ্গে মাছের ঘাটতি পূরণের পক্ষে পথ-প্রদর্শনের কাজ করা।

বিধানচন্দ্রের আমলে দেশে জমিদারি-প্রথা লোপ পায় এবং ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনের হয় সূচনা। ব্যাপক আইন-প্রণয়নের মধ্য দিয়ে বিধানচন্দ্রই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম 'গ্রাম-পঞ্চায়ত'-প্রথার পুনর্জীবন দান করেন।

শহর-কলকাতার জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ কমাবার জন্য এবং জনাকীর্ণ কলকাতা শহর থেকে দূরে শ্রমশিল্পকে ঠাঁই ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনিই রচনা করেন 'কল্যাণী উপনগরী' পরিকল্পনা। তাছাড়া, বর্তমানে কলকাতার উত্তর-পূর্ব উপকণ্ঠে যে মনোরম 'লবণ-হ্রদ উপনগরী' গ'ড়ে উঠেছে, এও তো সেই দূরদর্শী বিরাট কর্মযোগী মানুষটির মহৎ উদ্যোগেরই বাস্তব পরিণতি। কলকাতার আশেপাশে এবং হাওড়া শহরে এই রকমের আরও চারটি উপনগরীর পরিকল্পনাও তিনি রচনা ক'রে যান।

ভাগীরথীর নাব্যতা রক্ষা ক'রে কলকাতা বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য 'ফরাক্কা বাঁধ'-প্রকল্পের মূলেও ছিল মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা ও উদ্যোগ। তাছাড়া, দীঘা উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণের ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের সহজ সুযোগও তিনিই ক'রে দিয়ে গেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে বিধানচন্দ্র জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যেমন কর্মতৎপর ছিলেন, তেমনি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হয়েও। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে ক্যানসার রোগের চিকিৎসাদি হ'তো। কিন্তু শুধু ক্যানসার রোগের মতো একটা মারাত্মক কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য পৃথক কোনো হাসপাতাল ছিল না। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যাতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক হাসপাতাল গ'ড়ে তোলা যায় সেই চিন্তা-ভাবনা করতেন ডাঃ রায়। তাই, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি সেই চিন্তা-ভাবনার সার্থক রূপ দিয়েছিলেন 'চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল' উদ্বোধন ক'রে। তাছাড়া, তাঁর উদ্যোগে ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন'-এর বিভিন্ন বিভাগের যেমন সম্প্রসারণ ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে 'আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'-এর এবং অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের। কার্সিয়ং-এর 'এস্. বি. রায় স্যানাটোরিয়াম'-এর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ব্যাপারে বিধানচন্দ্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ক'রে কম ক'রে প্রায় চার হাজার যক্ষ্মা-রোগীর চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা ক'রে যান। যক্ষ্মা-আরোগ্যোত্তর নরনারীর সেবাশুশ্রূষার জন্য তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মেদিনীপুর জেলায় একটি 'যক্ষ্মা-রোগী পুনর্বাসন উপনিবেশ'।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের শাসনাধীনে পশ্চিমবঙ্গ ম্যালেরিয়া রোগের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তার আগে ১৯৪৩ সালে, বাংলায় যেবার মন্বন্তর হয়েছিল,

সে-বার নানা রোগের সঙ্গে ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল মহামারীর আকারে। সেই সময় চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাক্তার বিধানচন্দ্র ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক বিশেষ একটি ট্যাবলেট তৈরি করেছিলেন। গাঁয়ে-ঘরের লোকেদের মুখে সেই ফলপ্রদ ওষুধটির নাম হয়ে গিয়েছিল 'বিধান-বটিকা'।

মুখ্যমন্ত্রী হয়েও বিধানচন্দ্র যে তাঁর চিকিৎসা-বিদ্যার প্রয়োগ সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি, এ-কথা সকলেই জানেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন যে, রোজ কিছুক্ষণ ধ'রে তাঁর বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের দেখবেন ও চিকিৎসাদির পরামর্শ দেবেন। সে-কথা শুনে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন: "বিধানের মতো ডাক্তার বিনা পারিশ্রমিকে গরিবদের চিকিৎসা করবে, এর থেকে ভালো আর কী হ'তে পারে।" সেই ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তাঁর জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত। তিনি তাঁর প্রাত্যহিক কাজ শুরু করতেন রোজ সকালে একঘণ্টা ধ'রে রোগীদের পরীক্ষা ক'রে, তাদের চিকিৎসাদির নির্দেশাদি দিয়ে। এ-ব্যাপারে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকালের সেই একটি ঘণ্টা তাঁর গৃহদ্বার ছিল সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বস্ত উপসচিব শ্রীসুধীরমাধব বসু তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন: "কত দুরারোগ্য রোগ যে তিনি ভালো করেছেন তার হিসাব নেই।...এক মহিলা তাঁকে দেখাতে হাজারিবাগ থেকে আসেন। তাঁর ক্যানসারের চিকিৎসা হচ্ছিল। একবার খালি জিব্ দেখে ওষুধ লিখে দিলেন। মহিলা বাইরে এসে খুব বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলেন, কষ্ট ক'রে এত দূর থেকে এসে এই চিকিৎসা! কিছুতেই ওষুধ খেতে চান না। আত্মীয়-স্বজনের কথায় বহুকষ্টে ওষুধ খেলেন। তিন দিন পর ওষুধ চেয়ে খেতে আরম্ভ করেন। ওষুধ ফুরিয়ে গেল, কিন্তু ওদিকে কোথাও ওষুধ পাওয়া যায় না। পাটনায় গিয়ে খোঁজ নেন। কাগজে লেখা ওষুধ

তারা দিতে রাজী হয় না, বলে ওটা লাগাবার জন্যে, খাবার জন্যে নয়! পরে ডাঃ রায়ের দেওয়া ওষুধ শুনে দেয় ও বই খুলে রেফারেন্স থেকে ছাখে সেটা একটা পুরাতন পদ্ধতি, তখন আর চলে না। মহিলা কিন্তু কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।

"বর্ধমানের জনৈক হেড্‌মাস্টার মহাশয় হাঁপানিতে খুব ভুগছেন। ব্যবস্থা দিলেন—বড়ো চামচের এক চামচ এন্‌গার্স ইমাল্‌সন ও ছুটো সিডানটন ট্যাবলেট একসঙ্গে খেতে হবে। রোগী ওষুধ শুনেই মুষড়ে পড়লেন। বললেন, ঐ ছুটো ওষুধ আমি আগেই খেয়েছি, তাতে কোনো উপকার হয় নি। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, উনি যে-ভাবে খেতে বলেছেন ঠিক সেইভাবেই খেয়েছিলেন কি?—'না, ঠিক ঐভাবে খাই নি বটে, তবে সিডাটন অনেক খেয়েছি, আবার এন্‌গার্সও খেয়েছি।' অসন্তুষ্ট মনে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। তবে, ব্যবস্থা অনুযায়ী ওষুধ খেতে আরম্ভ করলেন। তিন দিন পর শরীরের মধ্যে একটা খুব অসোয়াস্তি হ'তে থাকে। ডাঃ রায়কে খবর দেওয়া হ'লে তিনি শুনে বললেন—'শিকড় অনেক ভেতরে চ'লে গেছে। বড়ো গাছ ফেলতে গেলে মাটি নড়বেই।' তিনি আগের মতোই ওষুধ খেয়ে যেতে উপদেশ দিলেন। কিছুদিন পরে খবর পাওয়া গেল যে, ভদ্রলোক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এখনও বেঁচে আছেন, মাঝে মাঝে বলেন—সেদিন কি ভুলই না করেছিলুম—বিধান রায় ব'লেই সম্ভব এক ওষুধকে প্লাস মাইনাস করা।"

রাইটার্স বিল্ডিংসে ব'সে কাজ করতে করতেও, কারো শরীরে রোগের কোনো লক্ষণ দেখলে, বিচলিত হয়ে উঠতেন পশ্চিমবঙ্গের ভিষগপ্রধান মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব বিভাগের তৎকালীন বিশেষ উপদেষ্টা তথা সাহিত্যসেবী শ্রীসুধাংশু-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে: "আমরা অনেকেই ওঁর ঘরে কী-একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি—এমন সময় একজন

খুব সিনিয়ার আই. সি. এস্. অফিসার একটি 'Immediate'-মার্কা ফাইল হাতে ক'রে ঢুকলেন—।...ডাক্তার রায় মুখ নীচু ক'রে ফাইল দেখছিলেন—হঠাৎ মুখ তুলে তাঁকে দেখে তাঁর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ কড়া ও চড়া সুরে বললেন—get out, get out, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা স্লিপে কী একটা লিখলেন। সবাই অবাক। ভদ্রলোক হতভম্ব, মুখ নীচু ক'রে লজ্জিত ও অপমানিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ডাক্তার রায় তাঁর পি. এ.-কে ডেকে বললেন—ওঁকে এই স্লিপটা এখনি দাও, আর পি. জি.-তে (পি. জি. হাসপাতালে) পাঠাবার ব্যবস্থা করো—গাড়ি আছে তো ?—আমরা আরও অবাক, ব্যাপার কী—উনি বুঝতে পারলেন যে, ঘটনাটি একটু ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে, তখন বললেন—ওর মুখের দিকে চাইতেই মনে হ'লো যেন Facial Erysipelas (ফেসিয়াল ইরিসিপলাস)-এর first symptoms (প্রাথমিক লক্ষণাদি) ঠোঁটের কাছে—এখনি একটা Injection (ইন্‌জেক্‌শন) না দিলে একঘণ্টার মধ্যে সারামুখ ফুলে ঢোল হয়ে যাবে—বাঁচানো দুষ্কর—তাই নৃপেনকে (পি. জি.-র তখনকার সুপারিনটেনডেণ্ট) চিঠি লিখে দিলাম, এখনি ভর্‌তি ক'রে নিতে—দুপুরবেলা একবার দেখে আসবো। আমার গলাটা একটু চ'ড়ে গিয়েছিল, না ?"

আর-একটি কাহিনী। এও ঘটেছিল রাইটার্স বিল্ডিংসে। সুধাংশুমোহনের ভাষায় : "সেদিন উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় কী একটা পরিদর্শনে গেছেন। দশটায় আমরা রাইটার্সে ফিরছি। WBA-I (মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির নম্বর) গাড়িটা ঢুকতেই হৈ হৈ প'ড়ে গেল। সার্জেণ্ট, পুলিস, আর্দালী, কন্‌স্টেবল সবাই সন্ত্রস্ত। সেই ব্যূহ ভেদ ক'রে কোথা থেকে একটি যুবতী একটি রোগা ছেলে কোলে ক'রে এসে কেঁদে ওঁর পায়ে পড়লো। উনি হঠাৎ এই ধরনের অভিযানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, হকচকিয়ে গেলেন ও তৎক্ষণাৎ এমন রেগে উঠলেন যে সবাই হতভম্ব। সার্জেণ্ট পুলিসদের ধমক দিয়ে

বললেন—তোমাদের বরখাস্ত করা উচিত—ব'লেই গট্ গট্ ক'রে স্পেশ্যাল লিফ্‌টের দিকে গিয়ে উপরে চ'লে গেলেন। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, দেখি যে উনি আবার নামছেন,—কৌতূহলী হয়ে আমিও ফিরে এলাম। তখন সার্জেন্টদের হুকুম দিচ্ছেন—ওদের ডেকে নিয়ে আসতে। ততক্ষণে আসামীরা বেশিদূর যেতে পারে নি—রাস্তা পেরিয়ে ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। স্বামী-স্ত্রী শিশুপুত্রসহ সার্জেন্টরা ওদের নিয়ে এলো। ওরা ভাবলে এবারে বোধহয় একেবারে পুলিসের গারদে! কি কুক্ষণেই-না ওরা বিধান রায়ের নাম শুনে পীড়িত শিশুটিকে দেখাতে এসেছিল! যাই হোক, বিধানচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন—এবারে সভয় বরদ মূর্তিতে—ঐখানে দাঁড়িয়েই ছেলেটিকে দেখলেন, পেটটা টিপলেন—তারপর সার্জেন্টের কাছ থেকে একটা কাগজের স্লিপ নিয়ে কী লিখলেন। বললেন, এই ওষুধটা নিয়ে যাও, এইখানকার ডিসপেনসারী থেকেই, টাকা দিতে হবে না—কী রকম থাকে এক সপ্তাহ পরে জানিয়ো—ওষুধ নিয়ে যাও। এখানে আসতে হবে না, আমার বাড়িতে যাবে—প্রত্যহ সকালে একঘণ্টা ক'রে রোগী দেখি। রাইটার্সের ডাক্তারখানা থেকে ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

"ব'লেই আবার ফিরে গেলেন নিজের কাজে। পরে আমাদের বলেছিলেন যে—আমার অতটা rude হওয়া বোধহয় ভালো হয় নি। দূর গ্রামদেশ থেকে মরণাপন্ন ছেলেকে কোলে নিয়ে বেচারীরা এসেছে বিধান রায়কে একবার দেখাবে ব'লে—তাই ফিরে এলাম। আমি জিজ্ঞাস করলাম—কী হয়েছে স্যার?—বললেন, Infantile Liver (ইনফ্যানটাইল লিভার)—সিরোসিস্, জল জমেছে—বোধহয় বাঁচবে না, দেরি হয়ে গেছে। তবে একটা নতুন জার্মান ওষুধ বেরিয়েছে—আমাকে কম্‌প্লিমেণ্টারি কয়েকটা শিশি পাঠিয়েছে—তাই দিলাম, একটা যদি উপকার হয়।"

মানবদরদী এই যে মন, এর তুলনা কোথায়?

মুখ্যমন্ত্রীরূপে ডাক্তার বিধানচন্দ্র ছিলেন সামগ্রিকভাবে এক কেন্দ্রপুরুষ। সরকারের সকল বিভাগের কাজকর্মের পরিকল্পনায় তাঁর ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টি। দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসার সাধনে বরাবরই তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন। তাঁরই উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, আর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। তাছাড়া, স্বদেশীযুগের 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-কে আইনগতভাবে 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে' তিনিই পরিণত ক'রে গেছেন। জেলায় জেলায় কারিগরী বিদ্যালয় বা পলিটেকনিক স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ তিনি যেমন নিয়েছিলেন, তেমনি বহুতর কলেজ সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের প্রয়াসে। তাঁরই অনুরোধে রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিদ্যাপীঠ গঠন করেন। পুরুলিয়ার উপকণ্ঠে বিস্তৃত আম্রকুঞ্জে সেই বিদ্যাপীঠ উদ্বোধন করতে গিয়ে ডাঃ রায় বলেছিলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো দেশসেবায় ব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এইভাবে দেশে শিক্ষাবিস্তারের কাজে উদ্যোগী হন, তাহ'লে তাঁদের কর্মযজ্ঞে দক্ষিণা দিতে দেশবাসীর কখনোই কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, জনসাধারণের অর্থের সদ্ব্যবহার সন্ন্যাসীরাই করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে আরও দুটি আবাসিক বিদ্যালয় গ'ড়ে ওঠে চব্বিশ পরগনা জেলার রহড়া ও নরেন্দ্রপুরে। এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গুণাগুণ আজ সকলের কাছেই সুবিদিত। পুরুলিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে একটি 'সৈনিক বিদ্যালয়' স্থাপনের কৃতিত্বও মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের। শিক্ষার উন্নতিসাধনে ও সম্প্রসারণে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ তিনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই ক'রে গেছেন। তিনি যখন এই কাজে প্রথম হাত দেন তখন শিক্ষাখাতে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বরাদ্দ ছিল পনেরো কোটি টাকা, সেই বরাদ্দ তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের শেষলগ্নে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ত্রিশ কোটি।

ভারতবর্ষে 'উচ্চতর কারিগরী প্রশিক্ষণ' ব্যবস্থার সৃষ্টিকর্মেও মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র ছিলেন এক অগ্রণী পুরুষ। খড়্গাপুরে 'ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি' স্থাপনের জন্য একদা প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ যে-উদ্যম গ্রহণ করেছিলেন, সেই উদ্যমের বাস্তব রূপ দিতে সহযোগিতা করেছিলেন ডাঃ রায়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারের খাস জমি দেওয়া থেকে শুরু ক'রে, আরও নানাভাবে তিনি সাহায্য করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রকেব অধীনে খড়্গা-পুরের এই 'আই. আই. টি'-র 'বোর্ড অব্ গভর্র্নস্'-এর চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

সরকারী উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে গঠনমূলক কিছু কাজ করা যায় কিনা, এ-কথাও মুখ্যমন্ত্রীরূপে মাঝে মাঝে তাঁর মনে উদিত হ'তো। সে-কথা তিনি স্পষ্টতই একদিন প্রকাশ করেন ১৯৫৩ সালের স্বাধীনতাদিবসে আয়োজিত এক বিদ্বজ্জনসভায়। তাঁর আমন্ত্রণ পেয়ে সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর 'রোটাণ্ডা'-হলে মিলিত হয়েছিলেন বাংলার বিশিষ্ট সব সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতকার তথা চারুকলাশিল্পের প্রতিনিধিবর্গ। সেই সভায় বিধানচন্দ্র এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, দেশের উন্নয়ন-মূলক সকল কাজে অংশ নিতে এগিয়ে আসবে দেশের কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ। সেই অগণিত জনসাধারণের মধ্যে যাতে দেশগড়ার জন্য একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়—সেজন্য দেশের সাহিত্যিক কবি, নাট্যকার, অভিনয়শিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী—এরাও তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের সৃজনপ্রতিভাকে কাজে লাগাবেন। কেননা, দেশোন্নয়নের মহৎ কর্মযজ্ঞে সকলেরই তো কিছু কিছু আহুতি-দানের প্রয়োজন আছে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত স্বনামধন্য সঙ্গীতকার পঙ্কজকুমার মল্লিক ও নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। রায় মহাশয় তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগে কর্মরত। সভার শেষে বিধানচন্দ্র তাঁদের দু'জনকে সম্মিলিতভাবে একটি

পরিকল্পনার খসড়া দিতে বলেন। অর্থাৎ, আনন্দ-দানের মাধ্যমে গ্রাম-প্রধান পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের সমাজে কিভাবে দেশোন্নয়নের কাজে লোকশিক্ষা বিস্তার করা যায়, তারই একটা পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা থেকেই জন্ম নেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য সংস্থা সর্বজন-পরিচিত 'লোকরঞ্জন শাখা'।

সেই নবসৃষ্ট 'লোকরঞ্জন শাখা'-র প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের সস্নেহ সহানুভূতি যে কত গভীর ছিল তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে পঙ্কজবাবুর নিজের লেখা একটি রচনায়ঃ "আমাদের কাজ শুরু হ'লো ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটস্থ একটি সরকারি গুদামখানার দ্বিতলে। সেখান থেকে কয়েকদিন পরে গেলাম আমরা নির্মাণ-অবসান-প্রায় সুবিখ্যাত সরকারি ভবন তেরোতলাবিশিষ্ট 'নব মহাধিকরণ'-এর ষষ্ঠতলে। মনে আছে, ডাঃ রায় শিল্পীদের মহলা ও প্রস্তুতিপর্ব প্রত্যক্ষ করবার জন্য একাধিকবার সিঁড়ি ভেঙে উঠেছিলেন সেই ষষ্ঠতলে—তখনো বৈদ্যুতিক উত্তোলন-যন্ত্রটি সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নি। মহলা দেখে উনি খুশী হয়েছিলেন।" 'লোকরঞ্জন শাখা'র উদ্বোধন হয় ১৯৫৪ সালের ২১ জানুয়ারি কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়, এক সান্ধ্য মিলন-আসরে। বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেদিন 'যাত্রা হ'লো শুরু' নৃত্যনাট্যের অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাঃ রায়কে বলেছিলেন—"Bengal's idea is unique. It can be produced in Bengal only and by the artistes of Bengal alone." ('বাংলার পরিকল্পনা অভূতপূর্ব। এ কেবল বাংলাতেই এবং বাংলার শিল্পীদের দ্বারাই প্রয়োজিত হ'তে পারে।) সরকারি পর্যায়ে সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যের এমন একটি প্রচার-মাধ্যম গ'ড়ে তোলা প্রকৃতপক্ষে মহাসাংগঠনিক বিধানচন্দ্রের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতাতেই সম্ভবপর হয়েছিল। এই পরিকল্পনা অনুসরণ ক'রে অন্যান্য রাজ্যে এই জাতীয় সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যের প্রচার মাধ্যম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের

'সঙ অ্যাণ্ড ড্রামা ডিভিশন' গ'ড়ে ওঠে বহু পরে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের আর-একটি অবদান 'নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত অ্যাকাডেমি'র প্রতিষ্ঠা। আজ যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি বিধানচন্দ্রেরই হাতেগড়া 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে' অন্তর্লীন, কিন্তু এর জন্মলগ্নে, ১৯৫৫ সালে তাঁরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের বাসভবন অধিগ্রহণ ক'রে স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গের সেই 'নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত অ্যাকাডেমি'। ডাঃ রায়ের আহ্বানে সেদিন বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর সানন্দে এসে যোগ দিয়েছিলেন অ্যাকাডেমির নৃত্য-বিভাগের 'ডীন' (পরিচালক-প্রধান) হয়ে, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এসেছিলেন নাটক-বিভাগের 'ডীন'-রূপে; আর, সঙ্গীত-বিভাগের 'ডীন' হয়ে যোগ দেন সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে যাতে নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত শিক্ষাদানের ব্যাপারে একটা উচ্চ মান ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যায়, এই অ্যাকাডেমি স্থাপনের মূলে ছিল বিধানচন্দ্রের সেই চিন্তা-ভাবনা।

তাছাড়া, কলকাতায় একটি 'জাতীয় নাট্যশালা' স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল বিধানচন্দ্রের। এই ব্যাপারে নাট্যাচার্য শিশির-কুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে কয়েকটি বৈঠকে তাঁর অনেক আলোচনাও হয়েছিল। কিন্তু, উভয়ের মতের পার্থক্য থাকায় সেই পরিকল্পনা কার্যকর হয় নি। এ-ব্যাপারে আর-কাউকে বিধানচন্দ্র ডাকেন নি এই কারণে যে, তিনি স্পষ্টতই বুঝেছিলেন, 'জাতীয় নাট্যশালা' একমাত্র শিশিরকুমার ভিন্ন আর কারো পক্ষে রূপদান করা সম্ভব নয়।

এ-কথা আজ সকলেরই জানা যে, মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' ফিল্মটির প্রযোজনার ভার গ্রহণ করেন। সরকারি প্রচার বিভাগকে তিনি শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র তৈরি ক'রে স্কুল-কলেজে, বিশেষ ক'রে বাংলার পল্লী এলাকায় ব্যাপকভাবে দেখাবার জন্যও উৎসাহিত

করতেন। তাছাড়া চিত্ত-বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে নির্দোষ ফিল্ম দেখাও যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার অনুকূল, সে-কথা স্বীকার করতেন ব'লেই তিনি হাসপাতালের রোগীদের ও জেলখানার কয়েদীদের মাঝে মাঝে ভালো ভালো ফিল্ম দেখাবার জন্য প্রচার বিভাগকে নির্দেশ দিতেন। সেই নির্দেশ তিনি দিতেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ততটা নয়, যতটা দিতেন একজন মানবদরদী চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ থেকে।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে খুব কম দামে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রকাশ ও বিতরণের মূলেও ছিল বিধানচন্দ্রের বিশেষ উদ্যোগ। দেশবাসীকে মাত্র পঁচাত্তর টাকায় পনেরো খণ্ড রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা পাঠ করার দুর্লভ সুযোগ সেদিন তিনিই করিয়ে দিয়েছিলেন।

একবার বিশিষ্ট ক্রীড়া-সাংবাদিক বেরি সর্বাধিকারী গেছেন রাইটার্স বিল্ডিংসে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। সর্বাধিকারীর হাত থেকে 'ফুটবলার অ্যানুয়াল' নামক বার্ষিক স্মারক-গ্রন্থটি নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ডাঃ রায় লক্ষ করলেন বইটির পাতায় পাতায় দেশ-বিদেশের স্টেডিয়ামের ছবি। মৃদু হেসে ডাঃ রায় সর্বাধিকারীকে বললেন—"করেছিস কী? এটা কি নন্-ভায়োলেণ্ট ভিস্যুয়াল এজিটেশন?" খানিকবাদে আবার বললেন—"এবার একটা স্টেডিয়াম তোদের ক'রে দেবই।" হ্যাঁ, সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও ক'রে গেছেন। আজ কলকাতার ইডেন-উদ্যানে যে বিরাট স্টেডিয়াম নির্মিত হওয়ায় হাজার হাজার ক্রীড়ামোদীর আনন্দের কারণ হয়েছে, সেই স্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যাপারেও তো ছিল বিধানচন্দ্রের আন্তরিক উদ্যম।

দার্জিলিঙে 'হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠার মূলেও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যোগ। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন শিক্ষাসচিব শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন লিখেছেন: "দার্জিলিং রাজভবনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে Mountaineering (মাউণ্টেনীয়ারিং) নিয়ে (বিধানচন্দ্রের) আলোচনা

হ'তো। উভয়েই সমান উৎসাহী। হিমালয়ের সমুন্নত শৃঙ্গমালায় ইউরোপের সব দেশেরই Mountaineer-রা নিজের দেশের গৌরব প্রতিষ্ঠায় উৎসুক। বার বার বিফল হবার পরেও উদ্যমের অভাব নেই। বিদেশীরা ভারতের শেরপাদের এতকাল কেবলমাত্র 'কুলি' ব'লেই চালিয়েছেন। জয়ের গৌরব বিদেশীদের, শেরপারা ভারবাহী 'কুলি' মাত্র। শেরপারা কিছু আসতো নেপালের পর্বত-পল্লী থেকে, আর-একদলের বসতি ছিল দার্জিলিং-এর কিনারায়। আরোহণের যাত্রাপথ ভারতের হিমালয়ের পাদদেশে। পর বৎসর ব্রিটিশদের আরোহণ-পর্ব আরম্ভ হবে। ভারত সরকারের অনুমোদন পাওয়া হ'লো। ডাঃ রায় ও পণ্ডিতজী বললেন, এর পর থেকে প্রধান শেরপাদের ইউরোপীয়দের (ইউরোপীয় পর্বতারোহণকারীদের) সমান মর্যাদা দিতে হবে। বিদেশী গোষ্ঠীদের সম্মত হ'তে হ'লো। শেরপারা শুধু ভার বহন করবে না, শৃঙ্গজয়ের বিজয়-গৌরবে ভারতের মর্যাদা তাদের হাতে। ব্রিগেডিয়ার হান্ট-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম এভারেস্ট শিখরে উঠলেন এই ব্রিটিশ ও ভারতীয় দলের টেনজিং এবং এড্মণ্ড হিলারি। এ ছাড়া কয়েকজন শেরপা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের বেছে রাখা হ'লো—আধুনিক প্রণালীতে Alps Institute (আল্প্স ইন্সটিটিউট)-এ শিখিয়ে এনে শিক্ষক হিসাবে (তাঁদের) নিয়োগ করা হবে। পণ্ডিতজী ও ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে বার্চ হিলে ভারতের Himalayan Mountaineering Institute গ'ড়ে উঠলো। পণ্ডিতজী ও ডাঃ রায় আজীবন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার একত্রে এই প্রতিষ্ঠান চালনা করেছেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দার্জিলিং-এর এই পর্বতারোহণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ধাঁচে ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি রাজ্যে পরবর্তী সময়ে পর্বতারোহণ-বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এ-দেশে 'ইয়ুথ হোস্টেল' প্রবর্তনের ব্যাপারেও বিধানচন্দ্র বিশেষ

উত্তোগ নেন। দার্জিলিং থেকে মাইল দশেক দূরে ফালুটে, কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি বনবিভাগকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র 'ইয়ুথ হোস্টেল' নির্মাণ করান।

দেশে যখনই কোনো বিশেষ সংকট দেখা দিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের প্রতিক্রিয়া তখনই প্রবাহিত হয়েছে গঠনমূলক পথে। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে ভাগীরথী নদীর দুই কূল প্লাবিত ক'রে যে-বন্যা এসেছিল, তার স্মৃতি বোধহয় এখনও অনেকের মনে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। ডাঃ রায় তখন জাপানে। পশ্চিমবঙ্গে সেই ভয়াবহ বন্যা হয়েছে খবর পেয়েই তিনি তাঁর ভ্রমণ-সূচী বাতিল ক'রে দেশে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র সেন বন্যা-ত্রাণের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বিধানচন্দ্র সরেজমিনে সব দেখে স্বতন্ত্র একটি নতুন ব্যবস্থা নিলেন। বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি যাতে সীমিত থাকে, সে-বার সেই উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেন 'নিজের ঘর নিজে বানাও' নামে একটি ত্রাণ-পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ কুঁড়েঘরের দেওয়াল মাটি দিয়ে তৈরি। বন্যার জলে সেই সব মাটির ঘর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ক্ষেত্রবিশেষে একেবারে বিলীনও হয়ে যায়। সেই ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে দরিদ্র মানুষদের আশ্রয়স্থল যথাসম্ভব সুরক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সেই পরিকল্পনা রচিত হয়। স্থির হয় চারটি ক'রে পরিবার একসঙ্গে মিলে ইট বানিয়ে, পাঁজা ক'রে, তা পুড়িয়ে নেবে। তারপর, সেই চারটি পরিবার তাদের জন্যে চারটি পৃথক পৃথক ছোটো পাকাবাড়ি তৈরি করবে। বাড়ির ছাদ তৈরি হবে করোগেট টিন দিয়ে। সবাই তো এইভাবে বাড়ি তৈরি করার কাজ জানে না। তাই সরকারি উত্তোগে গ্রামবাসীদের সেই গৃহ নির্মাণ-পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হবে। তাদের কাজ দেখাশোনার জন্য ট্রেনিং দেওয়া হবে শিক্ষিত বেকার যুবকদের।

আর, ইট তৈরি করা থেকে শুরু ক'রে গৃহ-নির্মাণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের ব্যয়ভার বহন করবেন রাজ্য-সরকার। শুধু তাই নয়, গৃহ-নির্মাণ কাজের জন্য যে-সময় ব্যয়িত হবে, তার জন্য যারা নিজেদের ঘর নিজেরা বানাচ্ছে, তারা সরকার থেকে উপযুক্ত মজুরিও পাবে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৬ সালের বন্যার পর কম ক'রেও ছাব্বিশ হাজার বাড়ি তৈরি হয়েছিল। আরও কিছু বাড়ি তৈরি হয় ১৯৫৯ সালের বন্যার পর। সরকার হয়তো ইচ্ছা করলে, বন্যাপীড়িত এলাকাগুলিতে এই ধরনের বাড়িঘর ঠিকাদারদের দিয়ে তৈরি করিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু দূরদর্শী বিধানচন্দ্র সেই গতানুগতিক পথে যান নি। তিনি চেয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট লোকজনের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও শ্রমেই গ'ড়ে উঠুক তাদের স্থায়ী আশ্রয়স্থল। তাছাড়া, ঐভাবে বাড়ি বানিয়ে তারা একদিকে পাবে সমবায়িক রীতিতে কাজ করবার শিক্ষা, অন্যদিকে পাবে উন্নতমানের জীবনযাত্রা-রীতির কিছুটা আস্বাদ।

৮

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধানচন্দ্রের মতো একজন দূরদর্শী মানবদরদী মহান্ কর্মীপুরুষকে পেয়ে একটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল স্বাধীনোত্তর দ্বিখণ্ডিত বাংলার পশ্চিমভাগের জনসাধারণ। বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গবাসী তাই পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচনে তাঁকে বিধানসভার সদস্য-পদে নির্বাচিত ক'রে তাঁরই হাতে তুলে দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসন ও উন্নয়নের ভার। কিন্তু তাঁর সেই যাত্রাপথ যে নিরুপদ্রব ছিল না ইতিহাসই তার সাক্ষী। রাজনীতিক বাতাবরণে সে-সময় কত-না আন্দোলন হয়েছে তাঁর পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে, বিধানসভায় কত-না তীব্র সমালোচনা। কিন্তু কোনো প্রতিকূলতাতেই তিনি ধৈর্য হারাতেন না, স্থিতপ্রজ্ঞের মতো তিনি তাঁর সংকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন।

কাজ, কাজ, আর কাজ। নিজে যেমন কাজ করতেন, অপরকেও তেমনি কাজ করতে অনুপ্রেরণা দিতেন। তাঁর জীবনাদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ছিল একটা বিরাট সামঞ্জস্য। তিনি বলতেন: "কাজ করতে করতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। অনেকের অনেক ক্ষমতা আছে, কিন্তু ব্যর্থতার ভয়ে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায় না। শাস্ত্রে আছে ফলাফলের উপরে নির্ভর না ক'রে কাজ ক'রে যেতে হবে। যতক্ষণ আমার শক্তি আছে ততক্ষণ আমি কাজ ক'রে যাবো।"

পরিশ্রম করবার সীমাহীন ক্ষমতা ছিল বিধানচন্দ্রের। এদেশের

সাধারণ মানুষ কর্মজীবন থেকে যে-বয়সে অবসর গ্রহণ করে, তিনি সেই বয়সের পরে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অথচ কী বিস্ময়কর তারুণ্য-শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন সেই প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের সন্ধিক্ষণে!

খুব ভোরে তিনি শয্যাত্যাগ করতেন। তারপর স্নান ও উপাসনাদি সেরে তাঁর বাড়িতে রোজ একঘণ্টা ক'রে রোগী দেখতেন। তারপর সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যেই পৌঁছে যেতেন রাইটার্স বিল্ডিংসে তাঁর নিজের কক্ষে। আগের দিন শেষ বেলায় বিভিন্ন বিভাগ থেকে পাওয়া যে-সব নথিপত্র তাঁর নির্দেশের জন্য তাঁর সহায়করা তাঁর টেবিলে জামা ক'রে রাখতেন, বিধানচন্দ্র সেগুলি দেখে তাঁর নির্দেশ ও মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ করতেন। এইভাবে চলতো অফিস শুরু হবার নির্ধারিত সময় বেলা দশটা পর্যন্ত। তারপর যে-সব নথির বিষয় নিয়ে বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন সেগুলির দিকে নজর দিতেন। সচিবরা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হ'তো। অনেক ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানরা অনেক নথি হাতে ক'রে নিয়ে যেতেন তাঁকে দেখিয়ে নির্দেশাদি পাবার জন্য। এই সময় সেগুলিও দেখে দিতেন। এরই মাঝে মাঝে বিভিন্ন সাক্ষাৎ-প্রার্থীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের বক্তব্য শুনে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন। এইভাবে চলতো সাড়ে বরোটা-একটা পর্যন্ত। তারপর তিনি পাশের একটি ঘরে, দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে, একঘণ্টা বিশ্রাম নিতেন। তারপর বেলা দুটো থেকে শুরু হ'তো আবার অফিসের কাজ। এই ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন তিনি করেছিলেন ১৯৫৪ সালে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার পর থেকে। সে সময় তিনি দুপুরের খাওয়াদাওয়া বিশ্রামের জন্য সাড়ে-বারোটার পর বাড়ি চ'লে যেতেন। রাইটার্স বিল্ডিংসে আবার ফিরে আসতেন তিনটের সময়। কাজ করতেন ছ'টা-সাড়ে-ছ'টা পর্যন্ত। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার আগে, আরও বেশিক্ষণ থাকতেন। কোনো-কোনো দিন রাত আটটাও হয়ে

যেতো। বিধানসভার অধিবেশন যখন বসতো, সেই সময় তিনি সাধারণত বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বিধানসভা-ভবনে নিজের কামরায় ব'সে নথিপত্র দেখতেন ; এম্. এল্. এ. ও এম. এল. সি-দের সঙ্গে কথা বলতেন, প্রয়োজন মতো বিধান সভাকক্ষে গিয়ে বিতর্কে যোগ দিতেন। কাজেই, দিনের প্রায় ন দশ ঘণ্টা তিনি অফিসেই কাটাতেন একটানা কঠোর পরিশ্রম ক'রে। একমাত্র রবিবার ছাড়া, অন্যান্য ছুটির দিনেও তিনি বেশ কয়েক ঘণ্টা রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে কাজ করতেন।

এই কর্ম-প্রসঙ্গে শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন : "মানুষের মন কোনো বিশেষ ইচ্ছা পূরণ করতে চাইলে, তার সহায়ক দুটি হাতের ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়। অনুরূপ-ভাবে, রাষ্ট্রের কর্ণধার পরিকল্পনা রচনা করেন, কিন্তু তার রূপায়ণের জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয় অনুগত সহায়কদের ওপর। ডাঃ রায়ের এমন সহায়কের কোনোদিন অভাব হয় নি। যা লক্ষ্য করবার, তা হ'লো তিনি নিজের গুণে তাঁর সচিবদের বা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মীদের আনুগত্য অর্জন ক'রে নিতেন।

"আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সেটা কী ক'রে সম্ভব হ'লো। তাঁর বাহিরের আচরণে শুষ্কতা এবং প্রশাসনিক কাজ আদায়ে কঠোরতা দেখে মনে হবে তাঁর পদাধিকারবলে এবং ব্যক্তিত্বের জোরে বলপূর্বক তাঁর সহায়কের কাছ হ'তে কাজ আদায় ক'রে নিতেন। কিন্তু যাঁরা কর্মসূত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছেন, তাঁরা জানেন এ-কথা ঠিক নয়। স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, নির্ভরযোগ্য আশ্রয় দিয়ে, আপন আচরণ দিয়ে, নানাভাবে তিনি তাঁদের যেমন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন, তেমনি তাঁদের কাছ হ'তে যথাশক্তি সহায়তা লাভ করতেন। তিনি যে সজ্ঞানে এগুলি ব্যবহার করতেন, তা নয়। তাঁর স্বভাবেই এই গুণগুলি প্রোথিত ছিল। তাঁর বাইরের শুষ্কতা ভ্রান্তিকর ; তাঁর অন্তরে স্নেহের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল।"

ডাঃ রায়ের আমলে এ-কথা আমরা যেমন সরকারের বহু বিভাগীয় সচিব ও অধিকর্তাদের মুখ থেকে শুনেছি, তেমনি নিজেরাও উপলব্ধি করেছি তাঁর নিকট সান্নিধ্যে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে। আবার ফিরে আসি শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতে। তিনি লিখেছেন : "এই প্রসঙ্গে মনে প'ড়ে যায় আমার অন্যতম সহকর্মী বন্ধু ডাঃ ভূপেশ দাসগুপ্তের কথা। তিনি পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব ও অধ্যক্ষ (অধিকর্তা) ছিলেন। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, ডাঃ রায়ের সঙ্গে কাজ করতে যেমন কষ্ট, তেমন আনন্দও আছে। কথাটা ঠিক। ডাঃ রায় ছিলেন কঠোর প্রশাসক। দ্রুত কাজ আদায় করতে সহায়কদের তিনি অবিরাম চাপ সৃষ্টি করতেন। কাজেই সর্বদা তৎপর থেকে, কঠোর পরিশ্রম না ক'রে উপায় ছিল না। ভালো কাজ করলে তিনি নিজে সুখ্যাতি করবেন, তাও নয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে একটা স্নেহের স্পর্শ পাওয়া যেতো। তার প্রকাশ নানাভাবে ঘটতো। কোনো কর্মচারী বাইরে থেকে প্রতিকূল আক্রমণের সম্মুখীন হ'লে, তিনি জানতেন ডাঃ রায় নিশ্চিত তাঁকে রক্ষা করবেন। এইভাবে পরোক্ষে তাঁর স্নেহ আকর্ষণ ক'রে কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সহায়করা প্রচুর আনন্দ পেতেন। অতিরিক্তভাবে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকালে দেশকে গ'ড়ে তোলার একটা ব্যাপক উন্মাদনা এসেছিল, যা শাসকদল এবং কর্মীর দল—উভয় গোষ্ঠীকেই অনুপ্রাণিত করেছিল। ...ডাঃ রায় প্রবীণ বয়সে যে কঠোর পরিশ্রম করতেন, তা দেখে আমরা তুলনায় নবীন হয়ে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে না পারলে লজ্জাবোধ করতাম। তিনি যদি দেশকে ভালোবেসে এই বয়সে এত কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন, আমাদেরও তা পারা উচিত—এই বোধ আমাদের নিত্য উদ্বুদ্ধ করতো।"

কোনো নিম্নপদস্থ অফিসারকে কাজের জন্য তাঁর প্রয়োজন হ'লে, ডাঃ রায় প্রথাসিদ্ধ নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতেন। যেমন, শ্রীসুধীর

মাধব বসুকে তিনি বলেছিলেন: "দেখ, যখনই এখানে আসবে, হিরণকে ব'লে আসবে।" হিরণ, অর্থাৎ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি তখন উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন কমিশনার তথা উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন বিভাগের সচিব। সুধীরমাধব তখনো মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব বিভাগের উপসচিব হিসাবে নিযুক্ত হন নি, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন কমিশনারের অধীনে কাজ করছেন। তাই অফিসের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য তাঁকে বলেছিলেন তাঁর বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি নিয়ে আসতে। শুধু সুধীরমাধবকেই নয়, এ-কথা তিনি অন্যান্য বিভাগের অধস্তন অফিসারদেরও স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, প্রয়োজন হয়েছে ব'লে তাঁদের তিনি ডাকছেন ও তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন বটে, কিন্তু সব সময় তাঁরা যেন তাঁদের বিভাগীয় প্রধানদের সে-কথা ব'লে আসেন।

শ্রীহিরণ্ময় বান্দ্যাপাধ্যায় লিখেছেন: "পদস্থ কর্মচারীদের আত্মসম্মানে যাতে না আঘাত লাগে, আমার মনে হয়, এ-বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। এমন স্পর্শকাতর অফিসার থাকতে পারেন যিনি অন্যকে দিয়ে ডেকে পাঠালে মানসিক আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকে। আমি লক্ষ্য করেছি আমাকে যখনই কোনো কাজে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠাতেন, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সহায়কের সাহায্যে ফোনের সংযোগ স্থাপন করিয়ে নিতেন এবং (স্বয়ং) বলতেন মাত্র দুটি কথা—'একবার এসো।' তিনি কোনোদিন অন্যের মারফতে আমাকে ডেকে পাঠান নি।"

কথাটি শুধু যে বিভাগীয় প্রধানদের ক্ষেত্রে সত্য তা নয়, অধস্তন অফিসারদের ক্ষেত্রেও এমন সুদুর্লভ আচরণ লক্ষ করা গেছে। আমি তখন স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের অন্যতম সহকারী অধিকর্তা। যেবার সোভিয়েট রাশিয়ার দুই নেতা বুলগানিন ও খ্রুশ্চভ একসঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন, সেবার ময়দানে অনুষ্ঠিত তাঁদের জনসভায় যোগদানের আমন্ত্রণলিপি বিলি করবার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে কার্ড বিলি করতে হ'তো এবং এই

কারণে প্রায় রোজই একবার বা দু'বার ক'রে তাঁর ঘরে যেতে হ'তো। তিনি রোজ কার্ড বিলির হিসাব নিতেন, অঙ্ক ক'ষে দেখতেন কত কার্ড গেল, কত কার্ড রইলো, এবং কাকে কাকে আর কার্ড পাঠাতে হবে তার নির্দেশাদি দিতেন। জনসভায় যাতে কঠোর নিরাপত্তা বজায় থাকে, সেই কারণে প্রত্যেক কার্ডের মাথায় প্রাপকদের নাম এবং খামের ওপরে আবার তাঁদের নাম ও পুরো ঠিকানা লিখে, খাম গালা দিয়ে সীলমোহর ক'রে এঁটে, বাহকদের বা প্রাপকদের কাছ থেকে প্রাপ্তিস্বীকারের স্বাক্ষর রেখে, তবে কার্ড বিলি করবার নির্দেশ ছিল। প্রত্যেক কার্ডে লেখা থাকতো একের কার্ড নিয়ে অন্য কেউ সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবেন না এবং প্রত্যেক কার্ডে সেই কার্ডের ক্রমিক-সংখ্যাও ছাপানো থাকতো দু' অংশে—অর্থাৎ, কার্ডের মূল অংশে ও তার সংলগ্ন অংশে বা কাউন্টার ফয়েলে। সেই নম্বর-সহ কার্ড প্রাপকদের নাম ও ঠিকানার দুটি তালিকা আমি তৈরি করিয়ে নিজের কাছে রাখতাম এবং দিনের শেষে রোজ পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগ থেকে একজন নির্দিষ্ট অফিসার এসে আমার কাছে থেকে সেই তালিকার একটি নিয়ে যেতেন তাঁদের পরীক্ষা বা অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য। কাজেই, ব্যাপারটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দিক থেকে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না যায়, এ-বিষয়ে সব সময় আমাকে সতর্ক থাকতে হ'তো। যাকে বলে রীতিমতো একটা টেন্‌শন বা স্নায়ুর চাপ, তাই চ'লেছিল বেশ ক'দিন ধ'রে।

একদিন বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের টেলিফোন এলো। ব্যক্তিগত সহায়কের মারফত ফোনের সংযোগ স্থাপন করিয়ে নিয়ে তিনি নিজে বললেন—"ওহে, একবার এসো তো!" সঙ্গে সঙ্গে চারতলা থেকে দোতলায় নেমে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি ঘরভরতি লোক। মুখ্যসচিব আছেন, অন্যান্য কয়েকজন বিভাগীয় প্রধান আছেন এবং বাইরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহে,

'অমুককে' কার্ড দাও নি কেন? সে অভিযোগ ক'রে চিঠি দিয়েছে।" অতর্কিতে এ-রকম একটা কথা শুনতে হবে তা ভাবি নি। তাছাড়া, রোজ কার্ড চেয়ে এত চিঠি আসে যে, সব পত্রলেখকের নাম মনে ক'রে রাখা সম্ভব নয়। তবে, এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী যাঁর নাম উল্লেখ করলেন, তিনি কলকাতার একজন শিল্পপতি। নাম ও তাঁর চিঠির ব্যাপারটা আমার মনে ছিল। তাই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলাম—"হ্যাঁ, তাঁকে কার্ড দিতে পারি নি। কারণ, তিনি একসঙ্গে চল্লিশ জনের নাম পাঠিয়ে চল্লিশখানা কার্ড চেয়েছিলেন। চিঠিখানা আপনাকে দেখিয়ে, আপনার নির্দেশ নিয়ে, তবে কার্ড ইস্যু করব ব'লে তাঁর লোককে দু'দিন পরে আসতে বলেছিলাম।" আমার কথা শুনে তিনি বললেন: "সে কী ব্যাপার! এক বাড়ি থেকে একেবারে চল্লিশখানা কার্ড? নিয়ে এসো তো চিঠিখানা।" সঙ্গে সঙ্গে আবার দোতলা থেকে চারতলায়। দেরাজ থেকে চিঠিখানা নিয়ে, আবার গিয়ে হাজির হলাম তাঁর সামনে। চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই তিনি তাঁর শ্রুতিধর-লিপিকার যতীনবাবুকে ডেকে, একটা জবাব মুখে মুখে ব'লে গেলেন। তার মর্মার্থ হ'লো—'প্রচার-বিভাগ কার্ড না পাঠিয়ে কোনো দোষ করে নি। যেহেতু আমাদের কার্ডের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, সেহেতু আপনাকে মাত্র চারখানা কার্ড দেবার জন্য ব'লে দিলাম। লোক পাঠিয়ে আগামীকাল সংগ্রহ ক'রে নেবেন অনুগ্রহ ক'রে।' অভিযোগের দায় থেকে মুক্ত হলাম বটে, কিন্তু সমস্যায় পড়লাম কোন্ চারজনের নামে কার্ড ইস্যু করব। সে-কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন: "ফার্স্ট ফোর।" অর্থাৎ, তালিকায় যে-চারজনের নাম প্রথমে রয়েছে, সেই চারজনকে কার্ড দিয়ো।

এইরকম দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেন বিধানচন্দ্র। 'কুইক ডিসিসন' নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর যেন একটা বিস্ময়কর সহজাত ক্ষমতা ছিল। তাছাড়া, তাঁর মধ্যে 'অহমিকাবোধ'-ই কি ছিল? না, আদৌ ছিল না। যিনি প্রকৃতই খুব বড়ো হন, তাঁর মধ্যে এই অহমিকাবোধ

থাকে না। বিধানচন্দ্র অহমিকাশূন্য ছিলেন ব'লে, সংশ্লিষ্ট সকল পদ-মর্যাদার অফিসারদের কাছ থেকেই দেশের জন্য দ্রুত কাজ আদায় ক'রে নিতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন: "পরেশ ভট্টাচার্য ছিলেন ইণ্ডিয়ান অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস্ সার্ভিসের একজন বিখ্যাত অফিসার। তিনি তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত সচিব। কতকগুলি ফাইল হাতে নিয়ে টাকা আদায়ের জন্য ডাঃ রায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা তাঁর কাছে হাজির হলেন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অনন্যসাধারণ মুখ্যমন্ত্রীকে ফাইল হাতে ক'রে তাঁর কক্ষে হাজির হ'তে দেখে সচিব মহাশয় অত্যন্ত অপ্রস্তুত হলেন এবং যা করবার তখনই তা ক'রে দিলেন। দুজনের সামাজিক পদমর্যাদায় অনেক ব্যবধান। সাধারণ ক্ষেত্রে এইভাবে কাজ আদায় করতে ওপরতলার মানুষ চাইবে না। কিন্তু ডাঃ রায়ের ক্ষেত্রে তা বাধার সৃষ্টি করে নি।"

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের প্রশাসনিক সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর নিজস্ব কর্মরীতি ও অগতানুগতিক নিয়ম পদ্ধতি। প্রতি বিভাগের মূল প্রকল্পগুলির ওপর তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকতো। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কাজের কতটা কী অগ্রগতি হচ্ছে সে-বিষয়ে তিনি শুধু খোঁজ-খবরই রাখতেন না, বিভাগীয় সচিব ও অধিকর্তাদের ডেকে প্রয়োজন-মতো তাগাদা দিতেন। কোনো প্রকল্পের যে-সব কাজ নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকা বাঞ্ছনীয় ব'লে তাঁর মনে হ'তো, সেগুলিকে রেখে দিতেন উন্নয়ন-বিভাগের আওতায়। ফলে বিধানচন্দ্রের শাসনকালে, উন্নয়ন-বিভাগের কর্মসূচী ছিল বহুধা-বিস্তৃত।

জরুরী সম্মেলন পরিচালনার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের ছিল একটা আশ্চর্যজনক ক্ষমতা। এ-বিষয়ে সাংবাদিক ও আমার সহকর্মী স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের তদানীন্তন সহকারী অধিকর্তা, শ্রীশৈলেন দাশগুপ্তের অভিজ্ঞতা: "একদিন একটি সম্মেলনে উপস্থিত থাকলাম তাঁর সম্মতি নিয়ে। বহু বিদেশী পরিকল্পনা-বিশেষজ্ঞ সেখানে ছিলেন

এবং আলোচনা হচ্ছিল উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে। হাতে কোনো কাগজপত্র নেই, অথচ ডাঃ রায় বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বক্তব্য রাখছেন বিভিন্ন পরিসংখ্যান উল্লেখ ক'রে। হিসাবের ভুলচুক নেই—সবই যেন তাঁর মুখস্থ। শুধু তাই নয়, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সুবিধার্থে তিনি খরচের অঙ্কগুলি স্টার্লিং, ডলার, ফ্রাঙ্ক এবং অন্যান্য বিদেশী মুদ্রায় বিবৃত করলেন শুধু মাত্র মুখে মুখে হিসাব ক'রে।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র একদিকে যেমন ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রশাসক, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন একজন গণতান্ত্রিক বিধায়ক বা পার্লামেণ্টেরিয়ান। বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ মতামতকে তিনি যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর এক স্মৃতিচারণায় বলেছেন : সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক বিষয়ে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার যে মৌলিক মতপার্থক্য ছিল তা সকলেরই জানা। তার ফলে অ্যাসেম্বলীর ভিতরে ও বাইরে নীতিগত বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধ বাধতো। কিন্তু আমাদের এই তীব্র মতদ্বৈধতা থাকা সত্ত্বেও, এবং সরকারের সঙ্গে আমরাই প্রধানত বিরোধিতা করলেও, তাঁর মধ্যে সৌজন্যের কোনো অভাব কিংবা প্রতিশোধমূলক কোনো স্পৃহা বা সংকীর্ণতা দেখি নি। যুদ্ধের সময় যখন আমাদের দলের কেউ কেউ, অরাজনৈতিক ও বিভিন্ন রাজনীতিক চিন্তাধারার লোকজনদের নিয়ে গঠিত, 'বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র সভাপতি হবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যান এবং সেই সময় জনসাধারণের মধ্যে সেই সংস্থা চমৎকার কাজই করেছিল। ১৯৪৯ সালে রাজনীতিক বন্দীরা জেলের অভ্যন্তরে তাঁদের অধিকার রক্ষার জন্য বড়ো রকমের একটা সংগ্রামে লিপ্ত হন। শেষপর্যন্ত গুলী চলে, কয়েকজন বন্দী পুলিসের গুলীতে নিহতও হন।

পরে ডাঃ রায় তাঁদের কতকগুলি জরুরী দাবি মেনে নিতে সম্মত হয়েছিলেন এবং কারাবন্দীদের নেতা কমরেড মুজঃফর আমেদ ও ডাঃ রায় সে-বিষয়ে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষরও করেছিলেন। অনেক সময় বিধানসভাকক্ষে এমন সব সাঙ্ঘাতিক রকমের হট্টগোল-হাঙ্গামা ঘটতো যে, তার ফলে সভার কাজ বন্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সুফল পাওয়া যেতো এবং সভার অধিবেশন পুনরায় চালাবার উদ্যোগ সফল হ'তো। এমন ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত জরুরী অনেক বিষয়ে বিধানসভায় সম্মিলিতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য ডাঃ রায়কে রাজী করাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি।

জনগণের রায়কে গণতান্ত্রিক বিধানচন্দ্র সবসময়েই সানন্দে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ছিলেন বাংলা-বিহার, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তিকরণের অন্যতম প্রধান প্রস্তাবক। কিন্তু সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের জনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। তখন লোকসভার উপ-নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এটা সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ভোটদাতা বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণের পক্ষে নয়। কেননা, লোকসভার যে-দুটি আসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে সেবার উপ-নির্বাচন হয়েছিল, সে-দুটি আসনের কোনোটিতেই কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সেই রায় মেনে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এই সব ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়েছে বার বার।

সাংবাদিক শ্রীসুদেব রায়চৌধুরী তাঁর একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পয়লা জুলাই (১৯৮১) বিধান শিশু উদ্যানের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে বললেন, ডাঃ রায়ের মধ্যে আমি কখনও সংকীর্ণতা দেখিনি। আমাদের সঙ্গে ওঁর রাজনৈতিক দিক

দিয়ে তীব্র মত-পার্থক্য ছিল। বিধানসভায় সিকিওরিটি বিল পাস করার সময় আমরা বিরোধীরা বার বার ডিভিশান দাবি করেছি। ভোটাভুটি হয়েছে। তখন বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ছিল না। বাইরে বেরিয়ে খাতাকলম নিয়ে ভোট দিতে হ'তো প্রতিটি সদস্যকে। অনেক সময় লেগে যেত। ডাঃ রায় লবিতে আমাকে একপাশে ডেকে বললেনঃ জ্যোতি, তুমি কি জানো না আমার গাউট আছে। বার বার বাইরে বেরিয়ে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি পাস করিয়ে দেবার সুযোগ দাও। তোমরা তো জানো মাত্র কয়েকজন সদস্য নিয়ে এ বিল আটকাতে পারবে না। আমি বললাম, আটকাতে পারবো না, জানি। কিন্তু প্রতিবাদ করবার অধিকার আমাদের আছে। প্রতিবাদের তীব্রতা বোঝানোর জন্য বার বার ভোটের দাবি করছি। ডাঃ রায় আর কোনো কথা না ব'লে ট্রেজারি বেঞ্চে নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়লেন। রাজ-নীতিকে কেন্দ্র ক'রে ডাঃ রায় কোনোদিন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হ'তে দেন নি।" মহৎ এই রাজনীতিক নেতার এইটি যে একটা বিশেষ গুণ ছিল সে কথা সকলেই স্বীকার করেন।

কাজপাগল মানুষ। কোনো কাজে অযথা বিলম্ব না ঘটে, সেদিকে সব সময়েই নজর। কাকে দিয়ে কখন কোন্ কাজটা সুষ্ঠুভাবে হবে, তা তিনি ভালো ক'রেই জানতেন। অর্থাৎ, লোক চিনতেন তিনি। সুদেববাবু লিখেছেনঃ "একদিন মেদিনীপুরে বন্যার ব্যাপারে জরুরী একটা কাজের জন্য একজন পদস্থ অফিসারকে রাত দুটোর সময় ফোন করলেন ডাঃ রায়।—ওহে, রিলিফ পাঠাবার ব্যবস্থা করো এক্ষুনি। অফিসার ভদ্রলোক খুব আস্তে বললেনঃ স্যার, আমি তো এডুকেশনে। ডাঃ রায়ঃ আরে, ওই হ'লো। তোমাকেই রিলিফ অফিসারকে ডেকে তুলে সব কিছু করতে হবে। দেরি ক'রো

না। আসলে ডাঃ রায় জানতেন, এডুকেশন বিভাগের ওই অফিসার ইচ্ছা করলে অন্য দফতরের অফিসারের কাজ করতে পারেন বা করিয়ে নিতে সক্ষম।" এ-রকম ব্যাপার অন্য কোনো কোনো বিভাগের অফিসারদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। অর্থাৎ, যে-বিভাগের অত্যন্ত জরুরী কোনো কাজের জন্য সেই বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারলে,—নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে না থেকে, বিকল্প অফিসারের সাহায্যে কাজটি করাবার ব্যবস্থা করতেন অতি দ্রুত।

সরকারি কাজকর্মের জন্য মন্ত্রীদের, অফিসারদের হামেশাই ছুটতে হয় কলকাতা থেকে নূতন দিল্লীতে। সেখানে তখনো 'বঙ্গভবন' হয় নি। কাজেই, অন্যত্র থাকতে গিয়ে, বিশেষ ক'রে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো অতিথিভবনে কিংবা কোনো হোটেলে, বিস্তর ঝামেলা ও অসুবিধা, খরচপত্রও অনেক। সময়মতো সব সময় 'রুম' পাওয়া যায় না, যানবাহনেরও অসুবিধা বা খরচ বেশি সেই কথা চিন্তা করেই ডাঃ রায়ের উদ্যোগে নূতন দিল্লীর হেইলি রোডে কেনা হ'লো একটি বাড়ি। বিধানচন্দ্রই তার নাম রাখেন 'বঙ্গভবন'। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের, অফিসারদের থাকবার যেমন ব্যবস্থা হ'লো, তেমনি সরকারি কাজকর্মে রাজধানী-শহরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য গাড়িও কেনা হ'লো। এর পর ডাঃ রায়ের দেখাদেখি অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও অনুরূপ উদ্যোগ নিলেন এবং রাজ্যভিত্তিক এক-একটি অতিথি ভবন গ'ড়ে উঠতে লাগলো। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের উদ্যোগেই দিল্লীর 'বঙ্গভবনে' একটি টেলিপ্রিন্টার-যন্ত্র স্থাপিত হয় এবং কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা হওয়ায় সরকারি পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বার্তা-বিনিময় ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। কাজেরও বিশেষ সুবিধা হয়। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের

বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ক'রে, পশ্চিমবঙ্গের বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তির সহায়তাকল্পে, দিল্লীতে তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের লিয়াজঁ-অফিসারের পদ সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রেও তাঁর সেই প্রশাসনিক দূরদর্শিতা।

কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসে কর্মচারীদের সুবিধার জন্য তিনিই মঞ্চ-সমন্বিত 'ক্যানটিন হল'-টি নির্মাণ করিয়ে দেন। যাতে অফিসের সময় কর্মচারীরা সেখানে আহারাদি করতে পারেন এবং অফিসের পর মঞ্চে সাংস্কৃতিক কোনো অনুষ্ঠান বা 'হলে' নিজেদের কোনো সভার আয়োজন করতে পারেন—সেই ব্যবস্থার সুবিধা রইলো সেখানে। ডাঃ রায়ের নির্দেশেই রাইটার্স বিল্ডিংসের বিভিন্ন দিকের লিফটগুলি স্থাপিত হয় সকল শ্রেণীর কর্মচারী ও বহিরাগতদের ওঠানামার সুবিধার জন্য। তার আগে কেবল সেন্ট্রাল গেটের 'লিফ্‌ট'-টি ছিল, তাও শুধু 'গেজেটেড অফিসারদের' জন্য! রাইটার্স বিল্ডিংসে আজ যে বিরাট গ্রন্থাগারটি রয়েছে তার উন্নতি ও আধুনিকীকরণও সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের উদ্যোগে। আগেকার লাইব্রেরিটি ছিল একতলার এক ঘরে, নিতান্ত অবহেলিতভাবে।

রাইটার্স বিল্ডিংসের দোতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনেকার প্রশস্ত বারান্দার দুই কোণে দুটি ঘেরা-জায়গা আছে। তার একটি 'ভিজিটার্স কর্নার' বা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের অপেক্ষা করবার স্থান, অন্যটি 'প্রেস কর্নার' বা সাংবাদিকদের বসবার জায়গা। এ দুটি কর্নারের আধুনিকীকরণও হয় ডাঃ রায়ের হস্তক্ষেপের ফলে। বিধানচন্দ্র কিন্তু ঘন ঘন 'প্রেস কনফারেন্স' ডাকতেন না। বছরে একদিন বা দু'দিন প্রেস কনফারেন্সে রিপোর্টারদের সঙ্গে বসতেন। তাঁর কাছ থেকে সাংবাদিকরা সব সময় যথেষ্ট স্নেহলাভ করেছেন এবং নানাভাবে উপকৃতও হয়েছেন। খবরের কাগজকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন মুখ্যমন্ত্রী

বিধানচন্দ্র। বাড়িতে, অথবা মহাকরণে যাওয়ার সময় গাড়িতে, তিনি খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ খবর বেশ খুঁটিয়েই পড়তেন। রাজ্য-প্রশাসনের কোনো খবর থাকলে, অথবা সরকারের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কোনো অভিযোগ প্রকাশিত হ'লে—তিনি তা লাল পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত ক'রে অফিসে নিয়ে যেতেন। সেই সম্পর্কে সঠিক বৃত্তান্ত জানবার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ডেকে পাঠাতেন।—সংবাদে প্রকাশিত সরকারি ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্য হ'লে তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। ভিত্তিহীন কোনো সংবাদ ফলাও ক'রে কোনো খবরের কাগজে ছাপা হ'লে, তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত বিরক্ত হতেন, রেগেও যেতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট খবরের কাগজের সম্পাদককে ফোন ক'রে জানিয়ে দিতেন। কিন্তু সেই বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অহেতুক কোনো আলোচনাই করতেন না।

'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র বরাবরই উদার মতাবলম্বী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিংহের মন্তব্য : "আমার স্মৃতিতে যে-বিষয়টি বেশি ক'রে জাগছে, তা হ'লো 'প্রেস কমিশন'-এর জনৈক সদস্য হিসাবে রাইটার্স বিল্ডিংসে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা। সে হ'লো ১৯৫২ সালের শেষদিককার অথবা ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিককার কথা। ডাঃ বি. সি. রায় তখন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। প্রেস কমিশনের সদস্যরূপে আমাকে রাজাগোপালাচারী, ডঃ কাট্‌জুর মতো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বেশ কয়েকজন প্রথম সারির সাংবাদিকের মতামত শুনতে হয়েছে। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, রাজাগোপালাচারী ও ডাঃ বিধানচন্দ্র এই দুজনের কথাগুলি আমার স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছে—বিশেষ ক'রে সংবাদপত্রের বিভিন্ন সমস্যা, সংবাদপত্রের কর্তব্যাদি, সাংবাদিকদের পেশা এবং তাঁদের সঙ্গে সরকারের সম্বন্ধ সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট মতামতের যথার্থতার জন্য।

ডাঃ বি. সি. রায়ের জবাবগুলি ছিল পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট। "মুষ্টিমেয় মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে তিনিই একজন, যিনি খুব সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, যে-কোনো মূল্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে, আর এ-ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ হওয়া উচিত সবচেয়ে কম।"

'কী হে, আজ বুঝি কিছু জোটেনি, নইলে আমার পিছনে ধাওয়া করেছ কেন ?"—একদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে, লিফটের দিকে এগোতে এগোতে, প্রেস কর্নার থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়া কয়েকজন রিপোর্টারের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র।

সেই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এ-কথা লিখেছেন সাংবাদিক শ্রীহরিদাস গুপ্ত। তাঁরা ডাঃ রায়কে বললেন যে, অমুক ব্যাপারের কোনো ডেভেলপমেণ্ট হ'লো কিনা সে-কথা জানবার জন্যই তাঁরা এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। ডাঃ রায়কে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাই তাঁরা ছুটে এসেছেন।

ডাঃ রায়ের জবাব : "তোমাদের কিচ্ছু বলবো না। তোমরা বড়ো উল্টোপাল্টা লেখো। আমি বলি এক, তোমরা লেখো আর-এক।"

হরিদাসবাবু লিখেছেন : "এ অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর পরিহাস। পরক্ষণেই তিনি দরকারী খবর দিয়ে রিপোর্টারদের খুশী করেছিলেন।"

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে একটি বিক্ষোভ চলেছে। বিক্ষোভ-কারীদের সঙ্গে নানারকমের শ্লোগান-লেখা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড। তাঁরা উত্তেজিত কণ্ঠে ধ্বনি তুলছেন, তাঁদের দাবি রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন, স্মারকলিপি দেবেন খোদ তাঁর হাতেই। সেই বিক্ষোভের ফলে ট্রাম-বাস বন্ধ, রাস্তায় ভিড়।

শেষপর্যন্ত চারজনকে অনুমতি দেওয়া হ'লো রাইটার্স বিল্ডিংসে

গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের স্মারকলিপি পেশ করবার।

বিক্ষোভকারীদের চারজন গিয়ে প্রবেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে। তাঁদের চোখেমুখে উত্তেজনা, কণ্ঠস্বরে প্রবল উষ্মা।

ডাঃ রায় সম্পূর্ণ শান্ত। মন দিয়ে তাঁদের প্রতিটি কথা শুনলেন। তাঁদের তিনি এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে, ব্যাপারটা তিনি দেখবেন, যথাযথ ব্যবস্থাও নেবেন। বিক্ষোভকারীদের তিনজন মুখে খুশির ভাব নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু একজন তখনো বিধানচন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কী? আর কী চাই? ডাঃ রায় চোখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে। তিনি টেবিলের ওপাশ থেকে একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "স্যার, আমার ঘাড়ের এই জায়গাটা সর্বদাই কেমন ফুলে ওঠে আর যন্ত্রণাও হয়। দয়া ক'রে একটা কোনো ব্যবস্থা করবেন?"

ডাঃ রায় মৃদু হেসে জবাব দিলেনঃ "শ্লোগান-দেওয়া গলা সারাবার কোনো ওষুধ নেই আমার।" পরমুহূর্তেই সেই বিক্ষোভ-কারীকে তাঁর টেবিলে ঠেস দিয়ে বসতে বললেন। টেবিলের ওপরে রাখা ফাইলের ওপর মাথাটা হেলিয়ে বিক্ষোভকারী তখন মুখ তুলে তাকালেন মুখ্যমন্ত্রীর দিকে।

মুখ্যমন্ত্রী সেই মুহূর্তে চিকিৎসকের রূপ ধারণ করেছেন। তাঁর অফিসকক্ষ তখন যেন ডাক্তারের চেম্বার। ডাঃ রায় অর্ধশায়িত সেই বিক্ষোভকারীর ঘাড়ের নানা জায়গায় টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন। তারপর চেয়ারে ব'সে, নিজের ব্যাগ খুলে একশিশি ওষুধ বের ক'রে সেই বিক্ষোভকারীকে বললেন—"এই ওষুধটা দিচ্ছি তোমাকে। এক সপ্তাহ খাবে। তারপর আমার সঙ্গে দেখা করবে। এখানে নয়, আমার বাড়িতে আসবে। একা এসো কিন্তু, আজকের মতো এ-রকমের প্রোসেশন নিয়ে নয়!"

বিক্ষোভকারীর মুখ তখন আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল। এসেছিলেন বিক্ষোভ জানাতে, ফিরে গেলেন দেশের সবচেয়ে বড়ো

চিকিৎসক দিয়ে নিজের রোগ পরীক্ষা করিয়ে ওষুধ পাবার আনন্দ নিয়ে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একজন গুরুগম্ভীর কঠোর প্রশাসক কিভাবে একজন মানবদরদী স্নেহবৎসল চিকিৎসকে রূপান্তরিত হতে পারেন, সে-দৃশ্য যাঁরা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তাকিয়ে দেখেছিলেন এই মহান্ মানুষটিকে।

৯

দেশ স্বাধীন হবার পর, ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতবর্ষে প্রতি বছর বিদেশী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আনাগোনা শুরু হয়। সে-ধারা এখনও অব্যাহত আছে। তাঁরা আসেন আমাদের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে, যেমন তাঁদের আমন্ত্রণে আমাদের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যান তাঁদের দেশ পরিভ্রমণ করতে। এ হ'লো কূটনীতিক প্রথার বিশেষ একটা অঙ্গ। দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় সৌহার্দ্য স্থাপন ও মৈত্রীর বন্ধন অটুট রাখবার বা জোরদার করবার প্রয়াস।

বিদেশী রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রনেতারা যখন রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে ভারত-ভ্রমণে এসে বিভিন্ন রাজ্যে যান, তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্যে তাঁদের স্বাগত-অভ্যর্থনা থেকে শুরু করে সভানুষ্ঠান, পৌর-সংবর্ধনা, দর্শনীয় স্থানসমূহ ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করা, বিদায়-সংবর্ধনা জানানো পর্যন্ত সব কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব থাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের ওপর। এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মোটামুটিভাবে কতকগুলি অবশ্য-পালনীয় নির্দেশ আগেভাগেই রাজ্য-সরকারকে দিয়ে রাখেন।

বিধানচন্দ্র যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসের একেবারে শেষদিকে কলকাতায় প্রথম বিদেশী রাষ্ট্রীয়-অতিথিরূপে আসেন যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোশিফ ব্রজ টিটো। তাঁর সঙ্গে সেবার দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী নেহরুও এসেছিলেন। ১৯৫৫-এর সূচনায় মার্শাল টিটো কলকাতাবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। লক্ষ করেছি, সেবার

যুগোস্লাভিয়ার এই রাষ্ট্রপতির আদর-অভ্যর্থনা ও ভ্রমণের যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যবস্থা সম্পর্কে ডাঃ রায় ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নিয়েছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তদারকও করেছেন।

শুধু মার্শাল টিটোর বেলাতেই নয়, সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রনেতার ক্ষেত্রেই অতিথিবৎসল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কর্ণধাররূপে ডাঃ রায় সব ব্যবস্থার খোঁজখবর রাখতেন, প্রয়োজন মনে করলে নতুন কোনো নির্দেশও দিতেন। ক্ষেত্র-বিদেশে বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় অতিথির সঙ্গেও ঘুরতেন। নিছক 'প্রোটোকল'-এর খাতিরে নয়, কতকটা যেন বঙ্গীয় অতিথি-বৎসল গৃহকর্তার মেজাজ নিয়ে।

স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৫৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে দু'জন বৈদেশিক রাষ্ট্রনেতার আগমন উপলক্ষে। এঁরা হ'লেন সোভিয়েট রাশিয়ার তৎকালীন সর্বোচ্চ দুই নেতা—নিকোলাই আলেক্জান্দ্রোভিভ্ বুলগানিন, আর নিকিতা সার্গেইভিচ্ খ্রুশ্চভ্। বুলগানিন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, আর খ্রুশ্চভ্ তখন রাশিয়ার কমিউনিস্ট-পার্টির প্রথম-সেক্রেটারী এবং সর্বোচ্চ সোভিয়েট-সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। একজন প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ-পদে (অবশ্য, প্রেসিডেন্টকে বাদ দিয়ে)—অন্যজন দেশের ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দলের শীর্ষদেশে। অর্থাৎ, স্ট্যাটাসের বা কৌলীন্যের দিক থেকে কেউ কারো চেয়ে কম যান না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারকে আগেই জানানো হয়েছিল যে, অভ্যর্থনার দিক থেকে রাশিয়ার এই দুই নেতাকেই সমান সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে।

বুলগানিন-খ্রুশ্চভের কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ পরিভ্রমণের সময় যে-বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এবং মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র যে নিজে সেই সব ব্যবস্থার দেখাশোনা করেছিলেন, তার কিছুটা আভাস

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনারও উল্লেখ করা যেতে পারে। অবাক্ হয়ে আমরা লক্ষ করেছি, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রেরও যেন সে-সময় অবসর নেবার ফুরসৎ ছিল না। বেশ ক'দিন তিনি এই অতিথি-আপ্যায়নের ব্যাপারে সকাল-সন্ধ্যা একটানা কাজ করেছেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি দু'জনের, সেই সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে যাঁরা আসছেন (বাহান্ন জন), তাঁদের থাকবার, বেড়াবার ব্যবস্থা তো আছেই,—তাছাড়া আছে দমদম বিমান-বন্দরে সম্মানিত অতিথিদ্বয়ের স্বাগত-অভ্যর্থনা, গড়ের মাঠে নাগরিক সংবর্ধনা, বিদায়-সংবর্ধনা, ইত্যাদি কূটনীতি বিধি অনুসরণের ব্যাপারগুলি। লক্ষ করেছি, যাবতীয় ব্যাপার-ব্যবস্থা সম্পর্কেই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র নিজে সংশ্লিষ্ট পদস্থ কর্মচারীদের কাছে খোঁজখবর নিচ্ছেন, রাজভবনে গিয়ে, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে, এমন কি দমদম বিমানবন্দরে যাওয়া-আসার পথের দু'ধারে তোরণ-নির্মাণ ও সাজসজ্জা ঘুরে ঘুরে দেখছেন, নিজে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত না-হওয়া পর্যন্ত ব্যবস্থাদির রদ-বদল করে চলেছেন। রাজভবনে বুলগানিন-খ্রুশ্চভ্ ছাড়া দলের আর কে কে থাকবেন, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে নাগরিক-সংবর্ধনা-মঞ্চ নির্মাণের কাজ কতদূর এগোলো, সেই সংবর্ধনা-সভার নিমন্ত্রণলিপি তাঁর নির্দেশমতো ঠিকঠাক বিলি করা হচ্ছে কিনা, পুলিসী-ব্যবস্থা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, অতিথিরা যেখানে যেখানে বেড়াতে যাবেন সেখানকার সংবর্ধনা ও ওঁদের ঘুরিয়ে সবকিছু দেখাবার আয়োজন কী-রকম-কী হচ্ছে, ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়েই তাঁকে সদাসতর্ক মনে হয়েছে। মাঝে মাঝে আবার নয়া-দিল্লীর সঙ্গে টেলিফোনে চলছে তাঁর সরাসরি আলোচনা।

১৯৫৫-এর ২৯ নভেম্বর।

বেলা ঠিক ১টা ৫৮ মিনিটের সময় মার্শাল বুলগানিন ও নিকিতা খ্রুশ্চভকে নিয়ে রাশিয়ার 'ইল্যুশিয়ান-১৪' বিমানখানি দমদম বিমান-ঘাঁটিতে এসে পৌঁছয়। দলের আর-সবাই আসেন সেই সঙ্গে, কেউ কেউ আবার আসেন তার আগে-এসে-পৌঁছানো অন্য দুটি বিমানে।

বিমানবন্দরের ভিতরে-বাইরে অগণিত উৎফুল্ল জনতা। কিন্তু বিশৃঙ্খলার কোনো চিহ্ন নেই কোনোখানে। আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা ও সামরিক অভিবাদনের পর, শোভাযাত্রা ক'রে যখন তাঁরা বিমানবন্দর ত্যাগ করেন, তখনও আশ্চর্য রকমের শৃঙ্খলা ছিল জনতার মধ্যে। কিন্তু শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে এসে উদ্বেলিত এক জনস্রোতের সম্মুখীন হ'তে হয়। ভিড় সেখানে এত হয়েছিল যে, সম্মানিত বিদেশী অতিথিদের যানবাহনকে পথ ক'রে দেবার জন্য পুলিসকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়—শেষপর্যন্ত জনতা-নিয়ন্ত্রণের জন্য মৃদু লাঠি-চালনাও করতে হয় তাদের। কম ক'রে সেদিন লাখখানেক লোক জড়ো হয়েছিল শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে রুশনেতাদের দেখবার অদম্য আগ্রহে। রুশনেতারা আসছিলেন খোলা গাড়িতে ক'রে। গাড়ির পেছনকার আসনে, দু'পাশে দুই নেতাকে নিয়ে, মাঝখানে উপবিষ্ট ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র। গিরিশ পার্ক পর্যন্ত রুশনেতাদের দেখবার কোনো অসুবিধাই হয়নি কারও। দর্শনমাত্রেই জনতার সে কী স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাস! বুলগানিন-খ্রুশ্চভের মুখ দেখেই বিধানচন্দ্র বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁরা দু'জনেই বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েছেন রাস্তার দু'পাশে অত লোক দেখে, আর তাদের মুখে 'হিন্দী-রুশী ভাই ভাই', 'বুলগানিন-খ্রুশ্চভ জিন্দাবাদ', 'রুশ-ভারত-মৈত্রী অক্ষয় হোক' প্রভৃতি অভিনন্দন-ধ্বনি শুনে।

কিন্তু অঘটন ঘটলো গিরিশ পার্ক ছাড়িয়ে খানিকটা এগুতেই। ভিড়ের অত্যধিক চাপে পথ ক'রে এগিয়ে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। সকলের কাছেই সে-রকম পরিস্থিতি একেবারে নতুন। ধীরে ধীরে বেলা তিনটে নাগাদ 'মার্সেডিস বেঞ্জ' মোটরগাড়িখানা যখন বুলগানিন-খ্রুশ্চভ আর মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রকে নিয়ে মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের কাছাকাছি অগ্রসর হয়, জনতার একাংশ তখন যেন উৎসাহের আতিশয্যে সকল শৃঙ্খলাবোধ হারিয়ে ফেলে। একদল লোক পুলিসকে ডিঙিয়ে ছুটে আসে গাড়ির দিকে। কেউ কেউ আবার

মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করবারও চেষ্টা করে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র স্বভাবত অস্বস্তিবোধ ক'রে জনতাকে নিরস্ত করতে যান, সিকিওরিটির লোকজনও ছুটে আসে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। অত্যুৎসাহী জনতার একাংশ শুধু অতিথি-দর্শনেই সন্তুষ্ট নয়, তাঁদের করস্পর্শের গৌরবলাভ করতেও চায়! ওদিকে গাড়ির এঞ্জিন ক্রমাগত থামতে থামতে এত গরম হয়ে উঠেছে যে, সে আর চলতে নারাজ! বার বার চেষ্টা ক'রেও ড্রাইভার ব্যর্থ হচ্ছে। ডাক্তার রায় পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব ক'রে, তৎক্ষণাৎ এক অভিনব কাণ্ড ক'রে বসলেন। শোভাযাত্রায় অনুগামী পুলিসের বেতার-ভ্যানটি থামিয়ে দিয়ে, তাতেই উঠে পড়েন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও কমিউনিস্ট-পার্টির সর্ব-প্রধানকে নিয়ে। তারপর সেই ঢাকা গাড়িতে ক'রেই তাঁরা সোজা চ'লে যান রাজভবনে। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প'ড়েও বিধানচন্দ্র বিন্দুমাত্র অসহায় বোধ করতেন না—সেই প্রতিকূলতা কিভাবে দ্রুত কাটিয়ে ওঠা যায় তার উপায় উদ্ভাবন ক'রে ফেলতেন।

অবস্থার চাপে পুলিসের গাড়িতে ক'রে রাষ্ট্রীয় অতিথিদের রাজ-ভবনে নিয়ে আসার জন্য সকলে দুঃখ প্রকাশ করলেও, তাঁরা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হননি। কারণ, কলকাতার নাগরিকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার যে-রূপ তাঁরা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাতে ক'রে তাঁরা এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, কূটনীতিক মর্যাদা কতখানি ক্ষুণ্ণ হ'লো সে-বিষয়ে কোনো আমলই দেননি।

পরদিন ৩০-এ নভেম্বর, প্রাতরাশপর্ব সমাধা ক'রে, রুশনেতারা ডাক্তার বিধানচন্দ্রের সঙ্গে চলে যান হাওড়ায়, স্টীমলঞ্চ 'হুগলি'-তে চেপে। প্রথমে তাঁদের ঘুরিয়ে দেখানো হয় হাওড়া জুটমিল, পরে বোটানিক্যাল গার্ডেন্স। বোটানিক্যাল গার্ডেন্সে 'হারবেরিয়াম' (বা গুল্মশালা) দেখে বেরিয়ে আসবার সময় এক মজার ব্যাপার! ডাঃ রায়, হঠাৎ কি মনে ক'রে, বুলগানিন-খ্রুশ্চভ্‌কে একটু দাঁড়িয়ে যেতে

অনুরোধ করলেন। শাঁখ হাতে হুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার ঠিক হু'পাশে। ইঙ্গিতে ডাঃ রায় তাদের বললেন শাঁখ বাজাতে। তারপর সেই শঙ্খধ্বনির তাৎপর্যটা বুঝিয়ে দিলেন সম্মানিত অতিথিদের। ওটা যে একটা মাঙ্গলিকী, তা জানতে পেরে খুশী হলেন তাঁরা। উত্তরভারত পরিভ্রমণের সময়েও অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা শাঁখের আওয়াজ শুনেছিলেন, কিন্তু তার তাৎপর্যটা তখনও জানতে পারেন নি: জানলেন হাওড়ায় এসে—মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের কাছ থেকে।

পরিহাস-প্রিয় বিধানচন্দ্রের একটা পরিচয় পাওয়া গেল সেবার সেই বোটানিক্যাল গার্ডেন্সে পরিভ্রমণের সময়। উদ্ভিদ্-উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে ডাক্তার রায় একবার লক্ষ করলেন যে, রুশ-নেতাদের দেখবার জন্য বাগানের এক জায়গায় অনেক মহিলা দর্শনার্থী জড়ো হয়েছেন। সেই দিকে রুশ-প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ডাক্তার রায় সরস ভঙ্গিতে ব'লে উঠলেন—আপনারা দেখছি সব মহিলাদের বিশেষ আকর্ষণ হ'য়ে উঠেছেন! পরিহাসে মার্শালও কম যান না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর দোভাষী মারফত জবাব দিলেন—ভাবছি, এর আগে কেন এ-দেশে আসিনি! সে-কথা শুনে মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে বিধানচন্দ্র বললেন—তাতে আর কী হয়েছে, এখনো সময় যায় নি! বলা বাহুল্য, সেই কৌতুকীতে সকলেই আনন্দলাভ করলেন।

পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের শীতকালে, আসেন মহাচীনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চু এন্-লাই, আর উপ-প্রধানমন্ত্রী মার্শাল হো লুং। ৮ই ডিসেম্বর, তাঁদের হু'জনকে দমদম বিমানবন্দরে, ফুটন্ত-রক্ত-গোলাপের স্তবক উপহার দিয়ে স্বাগত জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সেবারেও চীন প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গ-পরিভ্রমণে, তাঁর নাগরিক

সংবর্ধনার ও অন্যান্য কর্মসূচীর খুঁটিনাটি তদারক করেছিলেন ডাঃ রায় স্বয়ং।

সেদিন সন্ধ্যায় বিধানচন্দ্রের পরিকল্পনা অনুসারে বিচিত্র আলোক-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠেছিল রাজভবন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, নিউ সেক্রেটারিয়েট-ভবন, মনুমেণ্ট, রেড রোড, চৌরঙ্গী। তেরতলা নিউ সেক্রেটারিয়েট-ভবনের শীর্ষদেশ থেকে কলকাতা মহানগরীর সান্ধ্যরূপ দেখে চমৎকৃত হন চু এন্-লাই ও তাঁর সঙ্গীরা। সে-সময় কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার রায় তাঁদের কলকাতা পত্তনের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় দেন, সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন অক্টারলোনি মনুমেণ্ট (এখনকার শহীদমিনার) তৈরির ইতিহাস।

পরদিন ৯ই ডিসেম্বর সকালে সম্মানিত চীনা অতিথিরা যখন বরানগরে স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্সটিটিউট পরিদর্শনে যান, সে-সময়ে তাঁদের সঙ্গী হন বিধানচন্দ্র। সেদিন চীনের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দিরপ্রাঙ্গণে আমগাছের একটা চারা রোপণ করেন প্রতিষ্ঠান-কর্ণধার অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের অনুরোধে। উদ্দেশ্য চৈনিক রাষ্ট্র-নেতার পরিসংখ্যান-মন্দির-পরিদর্শনের স্মৃতি স্মরণীয় ক'রে রাখা। সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় চমৎকার একটি প্রস্তাব ক'রে বসেন। তিনি বলেন—ওই চারাগাছ যখন বড়ো হয়ে ফল দেবে, তখন সেই আমের নাম রাখা হবে চু এন্-লাই আম। বলা বাহুল্য, উপস্থিত সকলেই তখন বিপুল হর্ষধ্বনি ক'রে বিধানচন্দ্রের সেই প্রস্তাবে তাঁদের সমর্থন জানান।

সেদিন চীনা প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বেলা তিনটের সময়। বুলগানিন-খ্রুশ্চভ-এর পর এত বড়ো নাগরিক সংবর্ধনা-সভা আর অনুষ্ঠিত হয়নি সারা ভারতে। সংবর্ধনার উত্তরে সেই বিশাল জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে চু এন্-লাই তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁর মাতৃভাষা চাইনীজে। সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে, সেই চীনা-ভাষণের বাংলা তর্জমা প'ড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

বিধানচন্দ্র স্বয়ং। না, তিনি চাইনীজ জানতেন না। আগেভাগে চীনা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের যে ইংরেজী তর্জমা তিনি পেয়েছিলেন, তা থেকেই একটি বঙ্গানুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন জনসাধারণকে বোঝাবার সুবিধার জন্য। সরকারী দোভাষী এক্ষেত্রে ইংরেজীতেই বলতো। ডাক্তার রায়, তার বদলে, বাংলাতে চীনা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য জন-সাধারণকে পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেওয়াও তা সানন্দে গৃহীত হয়।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে, ভারত-ভ্রমণে এসে, আর যে-সব বিদেশী রাষ্ট্রনেতা, রাজা-রানী ও বিশিষ্ট অতিথি কলকাতা ঘুরে গেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইথিওপিয়ার সম্রাট্ হাইলে সেলা সী, তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা, ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ডঃ হো চি-মিন্, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর হুবার্ট হাম্ফ্রে এবং ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র সরকারী অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নিয়েছেন ও নির্দেশাদি দিয়েছেন। প্রত্যেকবারই দেখেছি, সেই সব রাষ্ট্রীয় অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ ও বিদায় অভিনন্দন জানাবার সময় স্বদেশপ্রেমিক বিধানচন্দ্রের পরনে দেশীয় পরিচ্ছদ—হয় ধুতি ও গলাবন্ধ লম্বা কোট, কিংবা ধুতি, 'পাঞ্জাবি' ও গরম শাল। তাঁকে সবচেয়ে বেশী অভিভূত হ'তে দেখেছি ১৯৫৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, দমদম বিমানবন্দরে—ডঃ হো চি-মিন্ যখন বিমানে আরোহণ করবার আগে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে, তাঁর বাম গণ্ডদেশে বিদায়-চুম্বন এঁকে দিয়ে গেলেন।

১০

মানুষ হিসাবে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের মধ্য দিয়ে যেন একটা পরিপূর্ণ যথার্থ মানুষের ছবিই ফুট ওঠে। সব ক্ষেত্রেই তিনি অনন্যসাধারণ।

কোনো ক্ষুদ্রতা বা সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। আকারে মানুষটি যেমন ছিলেন বড়ো মাপের, তেমনি বড়ো মাপের ছিল তাঁর মনটি। চেনা-অচেনা যে যখন তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে, সেই পেয়েছে তাঁর সাহায্য। ছোটোবড়ো কত-না আর্থিক সাহায্যই তিনি করেছেন—দুঃস্থ ছাত্র থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কত-না প্রতিষ্ঠান তাঁরই সাহায্যে সমস্যা ও সংকট কাটিয়ে উঠেছে। তাঁর এই সাহায্য-দানের ব্যাপারটা বিশেষ কোনো শ্রেণীর বা রাজনীতিক মতবাদের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কোনোদিনই সীমাবদ্ধ ছিল না। যাঁরা প্রকৃতই বড়ো মানুষ, তাঁরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতেই সব কিছু বিচার করেন।

কোমলে-কঠোরে কঠোরে-কোমলে এক আশ্চর্য মানুষ।

কলকাতার অন্যতম প্রাক্তন পুলিস-কমিশনার শ্রীপ্রণবকুমার সেন এই প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণায় এক জায়গায় যে-কথা লিখেছেন সংক্ষেপে তা হ'লো এই—১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র, শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা তদারক করবার উদ্দেশ্যে রোজ একবার ক'রে লালবাজারের পুলিস-হেড্‌কোয়ার্টার্সে সভা করতেন। লালবাজারের সেই কনফারেন্সে উপস্থিত থাকতেন সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান, মুখ্য-সচিব, স্বরাষ্ট্র-সচিব, প্রচার-

অধিকর্তা আর পুলিস-কমিশনার। ডাঃ রায় পুলিস-কমিশনার শ্রীসেনকে দেখিয়ে উপস্থিত সকলকে বললেন—এই তরুণ মনে করে সে যেন আমার চেয়েও বেশি জানে, বেশি বোঝে! শ্রীসেন সে-কথা শুনে সবিনয়ে নিবেদন করলেন যে, সেদিন তিনি যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা সন্তোষজনক। কেননা, সেই ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে সেদিন বড়ো রকমের অনেক হাঙ্গামা হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর জবাব: "আমি যে-রকম ব্যবস্থা নিতে বলেছিলাম, তুমি যদি তাই নিতে, তাহ'লে একটি হাঙ্গামাও হ'তো না।" সে-কথা শুনে পুলিস-কমিশনার শ্রীসেনের মুখটা যেন শুকিয়ে গেল। তিনি মাথা নীচু ক'রে রইলেন। তা ডাঃ রায়ের নজর এড়ালো না। সভাশেষে তিনি শ্রীসেনকে তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। তারপর শ্রীসেনের ভাষায়: "সেই প্রথম তিনি আমাকে তাঁর ড্রইংরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাকে বসতে ব'লে চ'লে গেলেন নিজের ঘরে। ফিরে এলেন দুটি আম নিয়ে, তারপর আদেশের ভঙ্গিতে আমাকে বললেন—'নাও, খেয়ে ফেলো। আজ যে বকুনি খেয়েছো, তার জন্য এই ব্যবস্থা!' এই স্নেহে আমি তখন একেবারে অভিভূত।"

কর্মক্ষেত্রে বিধানচন্দ্রের কঠোর হ'তে সময় লাগতো না। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় লিখেছেন: "তা সে জওহরলালই হন, আর মৌলানাই হন, কেউই রেহাই পেতেন না। মাঝে মাঝে ওয়ার্কিং কমিটিতে বেশ কড়া কড়া কথা বলতেন। কঠোর কথা। কিন্তু বলবার ধরন এমন ছিল, বিশেষ কেউ ক্ষুব্ধ হতেন না।" তবে প্রয়োজনে কঠোর হলেও, তাঁর আপাত গাম্ভীর্যের আড়ালে তাঁর স্বভাব-কোমলতা চির-অক্ষুণ্ণ।

তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই বলেন সে-কথা।

মানুষ-বিধানচন্দ্র একেবারেই সহজ সরল, ঘরোয়া মানুষ। সতীর্থ

বন্ধু, সহগামী, সহচর, অনুচর সকলের জন্যেই তাঁর সমান আগ্রহ ও দরদ।

একবার এক নির্বাচনী প্রচার-কার্যে ডাঃ রায় প্রদেশ-কংগ্রেসের কর্মীদের অনুরোধে গিয়েছেন নদীয়ার এক গ্রামে। সঙ্গে সাংবাদিকরাও আছেন। সেই সাংবাদিকদের একজন শ্রীশান্তিকুমার মিত্র। তিনি লিখেছেন: "পাগলাচণ্ডী গ্রামে নদীতীরে স্কুলবাড়িতে আমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।...আমরা ক'জন সাংবাদিক এক জায়গায় বসেছি। অদূরে ডাঃ রায় প্রমুখ বসেছেন। গরম বাটামাছ-ভাজা পরিবেশন হচ্ছে। ডাঃ রায় আমাদের উদ্দেশে হেঁকে উঠেছেন—কী প্রচণ্ড গলার আওয়াজ!—ওহে, খাও খাও, খুব ভালো মাছভাজা হে, ওহে, ওদের আরও দাও, দাও।"

মুখ্যমন্ত্রী হবার পর, প্রায়ই তাঁকে ট্যুরে যেতে হয়েছে। যখন যেখানে গেছেন সব সময় সহগামীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে তাঁর ছিল অভিভাবকের স্নেহসিক্ত নজর। কে কী খেতে ভালোবাসে সে-বিষয়ে তিনি খোঁজখবর নিয়ে রাখতেন আগে থাকতেই। অতুল্যবাবু লিখেছেন: "দীঘায় খাওয়া হচ্ছে। টেবিলে স্তূপীকৃত ট্যাঁপারি। আমাদের মধ্যে একজন ট্যাঁপারি খেতে ভালোবাসত। আম আছে, লিচু আছে, তার সঙ্গে ট্যাঁপারিও ঠিক সমান সম্মানে জায়গা পেয়েছে।" এই যে দেখাশোনা, এর মূলেও তো সেই অন্তরের স্নেহ। অনেককে নিয়ে একসঙ্গে হয়তো 'ব্রেকফাস্টে' বা বাঙালীর মতে 'সকালবেলাকার জলযোগে' বসেছেন, সে-সময়ে নিজের হাতেই খাবার এগিয়ে দিয়েছেন,—কখনো-বা নিজের হাতেই টোস্ট তৈরি ক'রে পরিবেশন করেছেন। টেবিলের পাশেই ইলেকট্রিক টোস্টার নিয়ে বসতেন। আমরা শুনেছি, শেষ বিদায়ের আগের দিন তাঁর বাড়িতে মন্ত্রিসভার যে বৈঠক বসেছিল, সেদিনও তিনি বিছানা থেকে উঠে কোথায় কে বসবে সব তদারক করেছেন, এবং কী কী খেতে দেওয়া হবে তাও ঠিক ক'রে দিয়েছেন। ভ্রমণসঙ্গী অতুল্যবাবুর ভাষায়: "ট্রেনে ক'রে যখন

কোথাও যেতেন, হয়তো একটা সেলুন আছে, সেলুনে যে রান্না করে তাকে ডেকে সকালে ব'লে দিতেন, 'কুমড়োশাকের চচ্চড়ি হবে?' মাছ যদি পাওয়া যায় ভালোই, না হ'লে ডিম হবে। একেবারে খুঁটিনাটি ব'লে দিতেন—গেরস্থ বাড়ির যেমন হয়, ঠিক তেমনি।"

কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে। তার জন্য প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। উদ্বোধনের আগের দিন প্যাণ্ডেল পরিষ্কারের সময়, নিজে রাত আড়াইটে নাগাদ সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, ঘুরে ঘুরে সব তদারক করেছেন। ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে বুলগানিন-খ্রুশ্চভের কিংবা চু এন্-লাইয়ের পৌর-সংবর্ধনা হবে, সংবর্ধনা-মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, তাও তিনি সন্ধ্যার দিকে বা রাত্রে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে এসেছেন।

কতদিকে কত নজর, কত সতর্কতা।

ট্যুরে বেরিয়ে, কিংবা কংগ্রেসের কাজে, কোথাও গিয়েছেন। ট্রেনের একই কামরায় কিংবা অতিথিভবনের একই ঘরে হয়তো আর-একজন সহগামী আছেন। রাত্রে যদি কখনো উঠতে হ'তো, তাহ'লে পাছে সহগামীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, সেজন্য ডাঃ রায় কখনো আলো জ্বালতেন না—টর্চের আলো নিচের দিকে রেখে উঠতেন। ভ্রমণ-পথে কোনো সঙ্গীর পায়ে হয়তো সামান্য একটা কাঁটা ফুটেছে। সে-কাঁটাও তিনি নিজের হাতে তুলে দিতে ছুটে এসেছেন। কোনো আপত্তি শোনেন নি। শুধু তোলা নয়, নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের আগে, নির্বাচনী-সভায় যোগ দিতে বিধানচন্দ্র কোনো গ্রামে গিয়েছেন। সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট এক অনুজ সহকর্মী। মাতৃবিয়োগের জন্য তিনি অশৌচ পালন করছেন, নিরামিষ খাচ্ছেন। ব্যাপারটা জানতেন ডাঃ রায়। যে-বাড়িতে সকলের আহারের আয়োজন হয়েছিল, সে-বাড়িতে পৌঁছে গৃহস্বামীকে তিনি বললেন—দেখো, আজ আমি নিরামিষ খাব। হঠাৎ নিরামিষ খাবেন কেন, তা আর কেউ হয়তো বুঝলো না, কিন্তু সেই

অনুজ সহকর্মী সহজেই বুঝে নিলেন। এমনও অনেকবার ঘটেছে যে, কোথাও কার্যোপলক্ষে গিয়ে সঙ্গীর প্রিয় কয়েক রকমের খাবার নিজে কিনে এনেছেন। কিন্তু সঙ্গীকে সেই খাবার দিতে গিয়ে কিনে-আনার ব্যাপারটা বেমালুম চেপে রেখে, মুখে শুধু বলেছেন—'ওহে দেখো তো এগুলো কেমন লাগে, একজন দিয়ে গেছে।' অর্থাৎ, এই যে স্নেহের দান, এর কোনো আড়ম্বরপূর্ণ প্রকাশ ছিল না। সবটাই তিনি করতেন অত্যন্ত সহজভাবে, নিতান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। এই যে তাঁর অভিভাবকত্ব, তা সর্বাংশেই ছিল স্নেহসিক্ত।

ঘরোয়া মানুষ বিধানচন্দ্র, তাঁর বাড়িঘর যারা দেখাশোনা করতো, যারা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নিত্য-সহচর বা নিত্য-অনুচর, তাদের প্রতিই কি কম স্নেহসিক্ত ছিলেন? তাঁর ব্যক্তিগত 'কাজের লোক' ওড়িশার জাজপুরের কৃত্তিবাস। চৌত্রিশ বছর বয়সে সে এসেছিল ডাঃ রায়ের খাস বেয়ারা হিসাবে কাজ করতে। সেই থেকে সে তাঁর কাছে কাজ করেছে একটানা আটাশ বছর, বিধানচন্দ্রের অন্তিমকাল পর্যন্ত। ছায়ার মতো সে থেকেছে তার 'সাহেবের' সঙ্গে, 'সাহেবের' সঙ্গে ঘুরেছে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দার্জিলিং, ভারতের কত জায়গা। বিধানচন্দ্রের পরলোকগমনের পর, পক্বকেশ ঋজুদেহ বাষট্টি বছরের কৃত্তিবাস অসীম রিক্ততায় ঝাপসা দুটো চোখ মেলে সাংবাদিকদের বলেছে: "সাহেব কত ভালোবাসতেন, জানেন? বিলেত থেকে সেবার আমার জন্য ঘড়ি এনেছিলেন। ঘড়িটা হারিয়ে গেল, আমারই কপাল!"

বাড়ির দেখাশোনা করতেন নিত্যকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তিনিও গর্বের সঙ্গে বলেছেন: "জানেন, ডাঃ রায় বিলেত থেকে আমার জন্য আলোসুদ্ধ একটা সেফ্‌টিরেজার এনে দিয়েছিলেন। আর এনেছিলেন কলম। সাহেবের নিজস্ব দশজন লোক, সবার জন্যই কিছু-না-কিছু এনেছিলেন।"

হ্যাঁ, সবার জন্যই তাঁর অন্তরে অন্তরে ছিল স্নেহ

কৃত্তিবাসের ভাষায়ঃ (মুখ্য) মন্ত্রী হবার পর থেকেই সাহেবের খাটুনি বড়ো বেড়ে গেল। রাত সাড়ে ন'টায় ঘুমুতেন, আর ভোর সাড়ে চারটায় উঠতেন। সকালে কফি কলা আর টোস্ট, এই তাঁর খাওয়া। দুপুরে কখনো ভাত, কখনো রুটি। তবে ফলের মধ্যে বেল, রোজ খাওয়া চাই।

সাধারণত রাত ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে ঘুমোতে যাবার অভ্যেস থাকলেও—বিশেষ জরুরী কাজকর্মের খাতিরে, যেমন সাধারণ নির্বাচনের আগে কোনো কোনো দিন রাত বারোটা অবধি, এমন কি তার পরেও, কাজ ক'রে তবে শুতে গিয়েছেন। অত রাত পর্যন্ত জেগেও, ঘুম থেকে উঠতেন কিন্তু ভোর সাড়ে চারটা পাঁচটার মধ্যেই।

বেশি রাত ক'রে খাওয়া-শোওয়া যেমন ভালো নয়, তেমনি ভালো নয় দেরি ক'রে ঘুম থেকে ওঠা। স্বাস্থ্যরক্ষার এই অমোঘ বিধান নিজে যেমন বিধানচন্দ্র মেনে চলতেন, তেমনি মেনে চলবার জন্য বলতেন অপরকেও। একবার শীতের সকালে খবরের কাগজের কয়েকজন রিপোর্টার ঢুকেছেন রাইটার্স বিল্ডিংসে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। সকলেই আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত। জনৈক সাংবাদিক স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছেনঃ "সেদিন শীতও পড়েছিল জবর। সারা শরীর ঢেকেও কাঁপুনি থামছিল না। ঢুকে দেখি, খদ্দরের পাঞ্জাবিভূষিত মুখ্যমন্ত্রী স্তূপীকৃত ফাইলের সামনে ব'সে। তাঁর গায়ে কোনো শীতের কাপড় নেই। তখনও মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষ তাপনিয়ন্ত্রিত হয় নি। কাঁপতে কাঁপতে বললাম, আজ বড়ো শীত। ডাঃ রায় বললেন —হোক শীত, এত জবুথবু হয়ে থাকবে কেন?"

কথায় কথায় উঠলো স্বাস্থ্যরক্ষার প্রসঙ্গ।

সাংবাদিকদের একজন জানালেন, তিনি পেটের গোলমালে

প্রায়ই ভোগেন। যাকে বলে ক্রনিক, তাই। চিকিৎসক-মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—'কখন খাও, কখন শোও ?' সেই সাংবাদিক বুঝলেন, ধরা প'ড়ে গেছেন। মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললেন—'রিপোর্টারদের খাওয়া-শোওয়ার কোনো সময়ের ঠিক নেই।' বিধানচন্দ্র হাতের ফাইল দেখতে দেখতেই ব'লে উঠলেন—'তবে ভোগ!' খানিক বাদে মুখ তুলে, দুটি অমোঘ বিধান দিলেন স্বাস্থ্যরক্ষার। প্রথম বিধান—'রাত আটটার মধ্যে রাতের খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে।' দ্বিতীয় বিধান—'রাত ন'টার মধ্যে শুলে ভালো হয়, তবে দশটার ভিতরে ঘুমিয়ে পড়া চাই-ই।'

নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিধানচন্দ্রের পারিপাট্য ছিল, কিন্তু বিলাসিতা ছিল না। ইউরোপীয় পোশাক পরতেন বিলেতে পড়বার সময় এবং বিলেত থেকে ফিরে এসে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপনা ও ডাক্তারি করবার সময়। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যেদিন থেকে খদ্দর পরা ধরেছেন, সেদিন থেকে খদ্দরের ধুতি আর খদ্দরের সাদা জামা। জামাটা না-শার্ট, না-পাঞ্জাবি। শার্ট-পাঞ্জাবির একটা সংমিশ্রণ! ওপরের দিকটা শার্টের মতো কলারওয়ালা, আর নিচের দিকটা পাঞ্জাবির মতো। সেই জামায় আবার দুটো বুক-পকেট, বোতাম দিয়ে আটকানো পকেটের ঢাকনা। অনেকে বলতেন—'শাঞ্জাবি!' শার্টের 'শা' আর পাঞ্জাবির 'ঞ্জাবি' দিয়ে সুকুমার রায়ের নিয়ম বর্হিভূ্ত সন্ধির মতো নতুন শব্দ! জামার নিচে গেঞ্জি বা ফতুয়া পরবার কোনো বালাই ছিল না। কি শীত, কি গ্রীষ্মে। তবে শীতকালে বাইরে বের হবার সময় গায়ে একটা গরম চাদর রাখতেন। আর, বিদেশী অতিথিদের স্বাগত জানাতে গিয়ে আনুষ্ঠানিক পোশাক হিসাবে ব্যবহার করতেন গলাবন্ধ লম্বা কোট।

পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে

নজর থাকতো। সব সময় পরিষ্কার জামাকাপড় পরতেন। জামায় ঝিনুকের বোতাম ছিঁড়ে গেলে, অনেক সময় তা নিজের হাতেই লাগিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে ব'সে ব'সে নিজের হাতে জামা-সেলাই করতে, এমন কি চেয়ারের ছেঁড়া কুশন সেলাই করতেও অনেকে দেখেছেন তাঁকে। ছেলেবেলা থেকেই তো স্বাবলম্বী।

ডাঃ রায়, রাইটার্স বিল্ডিংসে তাঁর অফিস-কক্ষে, নিজের টেবিলটি দিনে রোজ কয়েকবার ক'রেই নিজের হাতে গোছাতেন। অদরকারী কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলনা-জিনিসের টুক্‌রিতে যেমন ফেলে দিতেন, তেমনি দরকারী টুকরো কাগজপত্র রাবার-ব্যাণ্ড বা ক্লিপ দিয়ে সযত্নে এঁটে বাণ্ডিল বেঁধে গুছিয়ে রাখতেন। বড়ো কাগজ হ'লে, ছোটো-বড়ো নানা আকারের ফাইল-কাভারের মধ্যে সেগুলিকে গুছিয়ে রাখতেন পরিপাটি ক'রে। তাঁর টেবিলে এলোমেলোভাবে কিছু ছড়িয়ে প'ড়ে থাকতো না। টুকিটাকি জিনিসই কি কম রাখতেন হাতের কাছে—কিন্তু সব রাখতেন গুছিয়ে ও সযত্নে। প্রসঙ্গত শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "প্রশাসনিক কাজ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনোভাব ফুটে উঠতো তিনি যে-ধরনের 'পেপার-ওয়েট' ব্যবহার করতেন সেইমতো। তাঁর খোড়ার খুরের আকৃতির বড়ো টেবিলে যে 'পেপার-ওয়েটগুলি' প'ড়ে থাকতো সেগুলি দুই শ্রেণীর। একটির ওপরে লেখা থাকতো 'Have it done' ('হ্যাভ ইট ডান্') । তা হ'তে বোঝা যেতো, তিনি চাইতেন—তৎপরতার সহিত প্রশাসনিক কাজ নিষ্পন্ন হোক। আর একটায় লেখা থাকতো 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ'। অর্থাৎ, ফল যাই হোক, কাজ তোমার যত্নের সহিত ক'রে যেতে হবে ; অবসাদগ্রস্ত হয়ে কাজে শিথিল হ'লে চলবে না।"

শুধু 'পেপার-ওয়েট' নয়, কাগজ-কাটা ছুরি, ডেস্ক-স্ট্যাণ্ড, রকমারি সব কাঠের বা ধাতুর ব্লক, এসবও থাকতো। শুধু অফিসের টেবিলেই নয়, বাড়ির টেবিলে, শেল্‌ফেও নানারকমের টুকিটাকি নানা জিনিস।

সবই দরকারের, অদরকারী কোনোটাই নয়। বাড়িতে ঘরের দেওয়ালে কত কালের কত পুরনো ছবি। তাদের কোনো কোনোটা হয়তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধ'রে একই জায়গায় রয়েছে সযত্নে। একদিন কোনো একজন হয়তো সাহস ক'রে ব'লেই ফেললেন,—বড্ড সেকেলে আর পুরনো হয়ে গেছে ছবিগুলো, নতুন ছবি এনে সাজিয়ে দিই? সে-ধরনের কথা শুনলে খারাপ লাগতো বিধানচন্দ্রের। মনে আঘাত পেতেন। বলতেন: "ওগুলি কত মানুষের স্নেহের নিদর্শন। যেখানে আছে, সেখানেই থাক্ না। তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে? একদিন এসে হয়তো আমাকেই বলবে—বুড়ো মানুষ, এবার স'রে পড়ো; এখানে তো বেশ অনেক দিন ধ'রেই কাটালে, আর কেন, এ-জায়গা ছেড়ে এবারে চ'লে যাও।" সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতেন: "যুগের প্রতি, মানুষের ভাবপ্রবণতার প্রতি সম্মান বজায় রাখবে। আমার কাছে পুরনো দিনের স্মৃতির মূল্য যে অনেক।"

পুরনো দিনের স্মৃতির প্রতি বিধানচন্দ্রের মমতা ছিল অপরিসীম। তেমনি অসাধারণ ছিল তাঁর নিজের স্মৃতিশক্তি। একবার তিনি পশ্চিম জার্মানী ভ্রমণ করতে গিয়ে রাজধানী-শহর বনের একটি ওষুধের কারখানা পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁকে সেই ওষুধের কারখানা থেকে নীল রঙের চামড়ায় বাঁধানো একটি ডাইরি উপহার দেওয়া হয়। তার মধ্যে ছিল তাদের তৈরি কতকগুলি ওষুধের নাম। সেই নাম-গুলিতে চোখ বোলাতে বোলাতে তাঁর নজর পড়লো ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনিনের বদলে অন্য একটি ওষুধের নাম। ডাঃ রায় ডাইরির সেই পৃষ্ঠায় একটা ট্যাগ লাগিয়ে তাতে লিখে রাখলেন 'ম্যালেরিয়া'। সেই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরের কথা। ডাঃ রায় একদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে তাঁর ঘরে ব'সে কাজ করছেন। এমন সময় একটা টেলিফোন এলো। পাটনা থেকে ফোনে কথা বলছেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি জানালেন, আচার্য বিনোবা ভাবে বিহার পরিভ্রমণে এসে, হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু

কিছুতেই তিনি কুইনিন খেতে রাজী নন। তাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরোধ ডাঃ রায় যেন অবিলম্বে পাটনায় গিয়ে আচার্য ভাবের যথাযথ চিকিৎসার ভার নেন। তখন দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ছাড়বার মাত্র ঘণ্টা দুয়েক বাকি। ডাঃ রায় তাঁর এক সহকারীকে ডেকে বললেন—'একটা গাড়ি নিয়ে এখুনি আমার বাড়ি চ'লে যাও। সেখানে আমার রোগী দেখার ঘরে যে-টেবিল রয়েছে তার ডানদিকের তৃতীয় ড্রয়ারে দেখবে একটি নীল রঙের চামড়ায়-বাঁধানো ডাইরি রয়েছে। তাতে ট্যাগ-লাগানো 'ম্যালেরিয়া'-লেখা পাতায় একটা ওষুধের নাম আছে। সেই ওষুধটা জোগাড় ক'রে সোজা এয়ারপোর্টে চ'লে আসবে।' আশ্চর্য, ডাঃ রায়-নির্দেশিত ঠিক সেই জায়গাতেই সহকারী সেই ডাইরিটি পেয়েছিলেন—তাঁকে আর কোনোরকম খোঁজাখুঁজি করতে হয় নি।

কোনো বিষয় নিয়ে একবার আলোচনা হ'লে, ডাঃ রায় সহজে তা ভুলে যেতেন না। তার সূত্রটা ধরিয়ে দিলেই আগাগোড়া সব জিনিসটা যেন ছবির মতো তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো। বিশদ ক'রে তাঁকে আর মনে করিয়ে দিতে হ'তো না, তিনি নিজেই পূর্বেকার আলোচনায় কী কী কথা হয়েছিল তা ব'লে যেতেন। একবার কোনো সরকারি বিভাগের জন্য কোনো একটি বাড়ি অধিগ্রহণ করবার প্রস্তাব হয়। সেই বাড়িতে মোট কতটা জায়গা মিলবে, মেরামত ইত্যাদি করিয়ে নিতে কত খরচ পড়বে, ভাড়া বাবদ মাসে মাসে কত টাকা দিতে হবে, ইত্যাকার সব কিছু খতিয়ে দেখার পর প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। খুঁটিনাটি সব হিসেবটাই ডাঃ রায় নিজে করেছিলেন। বাতিল-হয়ে-যাওয়া সেই প্রস্তাবের নথিটি নিয়ে, তিন বছর পরে, বিভাগীয় অধিকর্তা গেলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের কাছে। কী ব্যাপার? না, সেই বাড়িটিই এবার অধিগ্রহণ করতে হবে বিভাগের নতুন একটি অফিসের জন্য। অধিকর্তার মুখে শুধু সেই কথা শুনেই ডাঃ রায়ের স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো তিন বছর আগেকার সেই

খুঁটিনাটি হিসেবপত্র। সংশ্লিষ্ট নথিটি তিনি খুলেও দেখলেন না। অধিকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন—'সে-বার তুমিই তো বলেছিলে বাড়িটা তিনতলা, তাই না?'

—'হ্যাঁ, স্যার!'

—'প্রত্যেক তলার আয়তন দু'হাজার বর্গফুট?'

—'হ্যাঁ, স্যার!'

—'বাড়িটার পিছনদিককার অংশটা ভেঙে ফেলতে হবে?'

—'হ্যাঁ, স্যার!'

তারপর ডাঃ রায় বাড়ির মালিকের নাম উল্লেখ ক'রে, সেই ভদ্রলোক কত ভাড়া নিতে রাজী হয়েছিলেন তাও সঠিক ব'লে গেলেন।

তাঁর এই আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে, অধিকর্তা তো অবাক্।

অতি-পরিচিত কোনো ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে থাকলেও, বিধানচন্দ্রের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো সহজ ছিল না। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো-আন্দোলন'-এর সময়কার একটি ঘটনা। সেই সময় বিশিষ্ট এক জননেতা ইংরেজ-সরকারের পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে ছদ্মবেশে ভারতের নানা জায়গায় ঘুরছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন কলকাতায়, এবং বিশ্বস্ত এক পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে রইলেন। হঠাৎ একদিন খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়তে, পরিবারের কর্তা ডাঃ রায়কে ডেকে আনেন। ডাঃ রায় ছিলেন সেই পরিবারেরই চিকিৎসক। ডাঃ রায়কে তাঁরা আনলেন বটে, কিন্তু আত্মগোপনকারী অসুস্থ ব্যক্তির কোনো পরিচয়ই তাঁরা বিধানচন্দ্রকে দেন নি। অসুস্থ ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দেখে মনে হ'তো ভদ্রলোক উত্তর ভারতের কোনো জমিদার-পরিবারের লোক। ছদ্মবেশটা এমনই নিখুঁত ছিল

যে, মুখের দিকে তাকালেও, আসল ব্যক্তিটিকে চেনা খুব সহজসাধ্য ছিল না। অথচ, ডাক্তার রায় তাঁকে দিব্যি চিনে ফেললেন! প্রথমটায় কিছু ব'লেন নি। প্রথমে রোগী হিসাবে ছদ্মবেশী ভদ্রলোককে পরীক্ষা করলেন, তারপর জিজ্ঞাসাদি ক'রে চিকিৎসার বিধি-ব্যবস্থা নির্দেশ করতে গিয়ে বললেন: 'জয়প্রকাশ, তুম্ কল্‌কাত্তাসে চলা যাও।' সকলেই চম্‌কে উঠলেন। ভাবলেন, ডাঃ রায় আগস্ট-বিপ্লবের অন্যতম নেতা ছদ্মবেশী জয়প্রকাশনারায়ণকে চিনতে পারলেন কী ক'রে!

অসাধারণ মানুষ, অথচ কী সাধারণ ও স্বাভাবিক ছিলেন।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় লিখেছেন: "পকেটে একটা ছোট্ট ব্যাগ থাকতো, তাকে মানিব্যাগও বলা যায় না, যেমন বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হাতে থাকে। দিল্লীতে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যেতে গাড়ি থামাতে বললেন। বললেন, 'ওহে, এই দোকানে কফি ভালো ব'লে শুনেছি।' ব'লেই গটগট ক'রে যে-সব জায়গায় ওই শ্রেণীর লোক যায় না, ঢুকে গেলেন। তবে একটা সুবিধে হ'লো বড়ো কেউ চিনতে পারলে না। খাওয়ার পর ছোট্ট ব্যাগটি খুলে গুনে গুনে পয়সা দিলেন। সে-দৃশ্য দেখলে কে বলবে—ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর!"

"খবর না দিয়ে এমন অনেকের বাড়িতে যেতেন, যাঁরা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেন নি—ওঁর মতো লোক তাঁদের বাড়িতে যাবেন। ওঁকে দেখে তো তাঁরা হতবাক্। উনি স্বচ্ছন্দে একটি টুল টেনে এনে ব'সে পড়তেন। তাঁদের সঙ্গে এমন এমন কথা আরম্ভ করতেন যে, কে বলবে তিনি একজন বিলেতফেরত ডাক্তার, কলকাতা করপোরেশনের মেয়র!"

ডাঃ রায়কে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরাই তাঁকে অনেক

সময় দেখেছেন বাড়িতে একা ব'সে তাস নিয়ে 'পেশান্স' খেলছেন। অবসর সময় কাটাতে এই 'পেশান্স' খেলা ছিল তাঁর একটা অভ্যাস। অনেকে বলেন, নিত্য দিনের অভ্যাস। রাত্রে আহারাদি সেরে শুতে যাবার আগে, খানিকক্ষণ 'পেশান্স' খেলা তাঁর চাই!

শুধু 'পেশান্স' নয়, সুবিধে পেলেই তিনি প্রিয়জনদের সঙ্গে ব'সে 'ব্রীজ্'-ও খেলতেন। ট্রেনে ক'রে কোথাও বেড়াতে গেলে, তাঁর সঙ্গের ব্যাগ থেকে বের হ'তো দু' জোড়া তাস। সহগামী আর তিন-জনকে নিয়ে তাস খেলতেন। তাঁর ভ্রমণসঙ্গী অতুল্যবাবুর ভাষায়ঃ "তাস খেলার সময় একটু একটু অপরের হাত দেখা, বা চিরেতন থাকতেও রুইতন দেওয়া এসব একটু থাকতো। ধরা পড়লেই বলতেন —'এগুলো তাস খেলার অঙ্গ।' অবশ্য, সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সব পরিবারে স্টেইক্-এ তাস খেলার রেওয়াজ আছে, উনি স্টেইক্-এ কোনোদিন খেলেন নি, মজা করবার জন্যই তাস খেলতেন।"

খেলাধূলার একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিধানচন্দ্র। ছাত্র-জীবনে নিজে ফুটবল তো নিয়মিতভাবে খেলেইছেন, ক্রিকেটও খেলেছেন মাঝে মাঝে। ক্রিকেটার রঞ্জি-র সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ ছিলেন তিনি। বলতেন—"রঞ্জির তুলনা নেই, রঞ্জির মতো ব্যাট্সম্যানও আর হবে না।...কারণ রঞ্জি ছিল জিনিয়াস, ম্যাজিশিয়ান। মেডিকেল কলেজে সবে ঢুকেছি, ইডেন-গার্ডেন্সে খেলা, রঞ্জি খেলবে, দেখতে গেছি। ওদিকের ক্যাপ্টেন লর্ড হক, যেদিকে ফিল্ড সাজান, ঠিক অন্যদিকে রঞ্জি বল প্লেস করে। লর্ড হককে কি বুড়বাকই না করেছিল রঞ্জি সেদিন, মাথার পেছনেও যেন দুটো চোখ আছে!"

সঙ্গীতের প্রতি বিধানচন্দ্রের একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই ব্রহ্মসঙ্গীতের ভক্ত। তাছাড়া, লোকসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেও তিনি ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে নিজের

বাড়িতেই গানের আসর বসিয়েছেন কত বার। সেই সব গানের আসরে বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণও করেছেন তিনি। পঙ্কজ মল্লিক, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেক যশস্বী সঙ্গীতশিল্পী তাঁর সস্নেহ আহ্বানে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে গান শুনিয়ে এসেছেন। চোখ বুঁজে বিধানচন্দ্র যখন ব্রহ্মসঙ্গীত বা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেন, তখন মনে হ'তো তিনি যেন এক প্রসন্নতার রাজ্যে বিরাজ করছেন। সারা মুখমণ্ডলে তারই চিহ্ন সুস্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন: "আমি ৫/৬ খানা গান গাইলাম। উনি খুব প্রীত হলেন। পরে উনি নিজে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ গান গাইতে বললেন। গানটি আমার জানা ছিল না। কিন্তু সেটা স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করলাম। বললাম, গানটির কথা আমার ঠিক মনে নেই। উনি বললেন—'সেজন্য কোনো অসুবিধা হবে না, তুমি গান গাইতে শুরু করো, আমি কথা ব'লে দেবো।' মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। শেষে ব'লেই দিলাম—গানটি আমার জানা নেই। পরে উনি আরও একটি গান গাইতে বললেন। এবার আমি ব'লেই দিলাম—এ-গান আমি জানি না। উনি শুনে বললেন, 'বলো কী হে, এ-সব গান তো আমরা ব্রাহ্মসমাজে ৫০ বৎসর আগে অনেক গেয়েছি। এ-সব গান হয়তো আর কারো কাছে পাবে না—সময় ক'রে এসো, আমি শিখিয়ে দেবো।...

"এর পর থেকে উনি অসুস্থ হ'লেই মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। তখন যা-সব গান গাইব সব তৈরি ক'রে আসতাম। ওঁকে গান শোনাবার ব্যাপারে একটা গুরুদায়িত্ব বোধ করতাম। প্রতিটি গানের উচ্চারণভঙ্গি, তার ধ্বনি, তার সুর, তার অভিব্যক্তি কোথাও যেন এতটুকু ব্যাহত না হয়। উনি চোখ বুঁজে শুনতেন। সারা মুখে একটা প্রসন্নতার আভাস। মনে হ'তো যেন একটা সিংহকে গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।"

চিকিৎসক-মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র গানকে একটা 'মানসিক পুনর্বাসন'-এর দাওয়াই হিসাবেও প্রয়োগ করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান (এখনকার বাংলাদেশ) থেকে আগত মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শরণার্থীদের জন্য। উদ্বাস্তুদের সাময়িকভাবে আশ্রয়দানের জন্য যখন বিভিন্ন শিবির খোলা হচ্ছে, দ্রুত খাদ্য ও বস্ত্রাদি পাঠানো হচ্ছে শিবিরে শিবিরে, সেই সময় তাদের মনের দিকটা ভেবে ডাঃ রায় একদিন এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন। ছিন্নমূল নরনারীদের মনটাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য, খানিক ক্ষণের জন্য তাদের একটু মানসিক আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে, শিবিরে শিবিরে গানের দল পাঠিয়ে দিলেন। সেই ব্যাপারে সেদিন তাঁর পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রে তুলতে সানন্দে এগিয়ে এসেছিলেন যশস্বী সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন। তাঁদের ব্যবস্থাপনায় উদ্বাস্তু শিবিরে শিবিরে গানের আসর বসতো। তাঁরাও গাইতেন, তাঁদের সঙ্গে আরও অনেকে গাইতেন। তাছাড়া, যখন দেখা গেল উদ্বাস্তুদের মধ্যেই অনেকে গাইতে পারেন, বাজাতে পারেন, তখন প্রত্যেক শিবিরে যাতে ক'রে এক-একটি সঙ্গীতদল গড়ে ওঠে, উদ্বাস্তুদের অবসাদগ্রস্ত জীবনে তাঁরা যাতে নতুন ক'রে আনন্দের সঞ্চার করতে পারেন—সেজন্য ডাঃ রায়ের সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিলেন। এক প্রস্থ ক'রে গান-বাজনার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হ'লো উদ্বাস্তুদের শিবিরে শিবিরে গ'ড়ে-ওঠা প্রত্যেকটি সঙ্গীতদলের জন্য।

গানের প্রতি পরিশীলিতমনা বিধানচন্দ্রের যেমন ছিল আকর্ষণ ও অনুরাগ—তেমনি ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি। দার্জিলিঙে কিংবা নেপালে গেলে তিনি তাঁর অবসর সময়ে ঘুরে বেড়াতেন। পার্বত্যভূমির বহুবিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করতে। একদৃষ্টে অবলোকন করতেন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে-আসা ঝরনাধারা ও কুলকুল শব্দে

বয়ে-চলা ছোটো-ছোটো নদীর অপরূপ রূপরাশি। হাতে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতেন নুড়ি, পাথর। আর, মুগ্ধনয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতেন পার্বত্যভূমির দশদিক আলো-করা বহুবিচিত্র ফুলসম্ভার। সেই সময় বিধানচন্দ্র যেন এক ভিন্ন মানুষ, প্রকৃতির রূপমুগ্ধ প্রসন্নচিত্ত উদাসী পথিক।

রানীখেত ও দার্জিলিং—এ দুটি জায়গা ছিল ডাঃ রায়ের কাছে বিশেষ প্রিয়। দার্জিলিঙে তিনি যেমন একদিকে 'হিমালয়ান জু' বা চিড়িয়াখানা স্থাপন করেছিলেন পার্বত্য পশু-পাখি সংগ্রহ ক'রে রাখার উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে অতুলনীয় অর্কিডের প্রদর্শশালাটিও গ'ড়ে ওঠে তাঁরই উদ্যোগে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র প্রতি ডাঃ রায়ের আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল কী অপরিসীম। চোখ অপারেশন করাতে তিনি প্রথম বার গিয়েছিলেন ভিয়েনায়, দ্বিতীয় বার দার্জিলিঙে। দার্জিলিঙে, অপারেশনের পর, ডাঃ লিণ্ডার যেদিন তাঁর চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, চোখ মেলে তিনি সর্বপ্রথম কী দেখতে চান—সেই সময় বিধানচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন: "অবশ্যই কাঞ্চনজঙ্ঘা, তবে সে যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে তার রূপরাশি দেখাতে ইচ্ছুক থাকে! তাছাড়া আর কিসের জন্য আমি এখানে এসেছি?"

ফুল বড়ো ভালোবাসতেন ডাঃ রায়।

ফুলের রঙ, ফুলের গঠন সবকিছুই মুগ্ধনয়নে দেখতেন তিনি। এই যে প্রিয় ফুল, তা তিনি অজস্র পেতেন তাঁর জন্মদিনে। গুণমুগ্ধ ভক্ত ও প্রিয়জনের উপহার-দেওয়া রাশি রাশি ফুলে ভ'রে উঠতো তাঁর বাড়ি। সেই ফুল পেয়ে তিনি নিজে যেমন খুশী হতেন, তেমনি খুশী হতেন সেই সব ফুল হাসপাতালের রোগীদের কাছে পাঠিয়ে। ফুল বিতরণের ব্যবস্থাটাও তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করতেন।

শুধু বাড়িতেই নয়, রাইটার্স বিল্ডিংসে তাঁর অফিসঘরের টেবিলেও ছিল কয়েকটি ফুলদানি। তাতে শোভা পেতো মরশুমী সব নয়ন-মনোলোভা পুষ্পস্তবক।

রাইটার্স বিল্ডিংসের ছাদে তাঁরই আগ্রহে চমৎকার একটি ফুল-বাগান গ'ড়ে উঠেছিল এক সময়। তাছাড়া, বিধানসভা-ভবনের ফুলের নার্শারীটিও সম্প্রসারিত হয় বিধানচন্দ্রের উদ্যোগে। সেই নার্শারীতে যেদিন বিদেশ থেকে আমদানিকরা 'টিউলিপ'-চারাগাছে প্রথম ফুল ফুটেছিল, সেদিন তাঁর চোখেমুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল অপূর্ব এক আনন্দ।

সেই রকমের আনন্দই তিনি পেতেন তাঁর স্বহস্তরচিত প্রতিটি পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে।

১১

বিরাট এক ব্যক্তিত্বের গুরু-গাম্ভীর্যের আড়ালে লুকিয়ে ছিল আশ্চর্যরকমের এক কৌতুকপ্রিয় সুরসিক।

হ্যাঁ, আমরা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কথাই বলছি।

আপাতগম্ভীর ডাঃ রায়কে দেখলে স্বভাবতই সাধারণ মানুষের ধারণা হ'তো, তাঁর মধ্যে বোধহয় রসবস্তুর একান্তই অভাব—তিনি নেহাতই একজন কাজপাগলা কাঠখোট্টা মানুষ। এ-ধারণা যে কত ভুল, তা তাঁরাই জানেন যাঁরা তাঁর নিকট-সংস্পর্শে এসেছেন। রসের একটা ফল্গুধারা যেন তাঁর আপাত-গাম্ভীর্যের অন্তরালে শিশুসুলভ সারল্যের মতো বইতো। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতার স্পর্শে সেই রসধারা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উৎসারিত হ'তো।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের কথা।

দিল্লীতে পৌঁছে, প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সঙ্গে কথা হবার পর, বিধানচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী গেজেটে ঘোষিত 'গভর্নর অব্ ইউ-পি'-র পদ ত্যাগ ক'রে সেদিন সন্ধ্যাতেই দেখা করতে গেলেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে।

ঠোঁটের কোণে শিশুসুলভ মৃদু হাসি মহাত্মার। ডাঃ রায়কে কাছে বসিয়ে তিনি বললেন: 'বিধান, তুমি যখন গভর্নরের পদ ত্যাগই করলে, তখন তো তোমাকে আর 'ইওর এক্সেলেন্সী' ব'লে সম্বোধন করা চলে না!'

সঙ্গে সঙ্গে সুরসিক ডাক্তার বিধানচন্দ্রের জবাব: 'গান্ধীজী, ও

নিয়ে ভাববেন না আপনি। আমি আপনাকে বরং একটা আরও ভালো সম্বোধনের বয়ান বাৎলে দিচ্ছি, আমার জন্য। আমি হচ্ছি 'রয়' (ROY), কাজেই 'রয়-আল' (ROYAL)! উপরন্তু, অনেক লোকের চাইতেই আমি মাথায় উঁচু (অর্থাৎ, HIGH)। কাজেই ভবিষ্যতে আপনি আমাকে বরং 'ইওর রয়-আল হাইনেস' (YOUR ROYAL HIGHNESS) ব'লেই সম্বোধন করবেন।'

রসের একটা তরঙ্গ যেন বয়ে গেল সারা ঘরে। প্রাণখুলে হেসে উঠলেন গান্ধীজী।

সরোজিনী নাইডুর বাক্‌চাতুর্য ও কৌতুকপ্রিয়তার কথা কংগ্রেস-মহলে প্রায় সকলেরই কমবেশি জানা ছিল। সুযোগ পেলে নেতৃ-স্থানীয় প্রায় সকলকে নিয়েই তিনি রঙ্গরসিকতা করতেন। যেমন গান্ধীজী সম্পর্কে তিনি একবার বলেছিলেন: 'ওঁকে দেখতে ঠিক যেন 'মিকি মাউস'-এর মতো!' সেই সরোজিনী নাইডু একবার গান্ধীজীর সামনে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের সঙ্গে কৌতুক করতে গিয়ে ভারি জব্দ হয়েছিলেন।

এলাহাবাদের 'আনন্দভবন'।

কংগ্রেস-নেতারা একবার সেখানে মিলিত হয়েছেন কোনো একটি বিষয়ের আলোচনা করতে। সভার শেষে, কয়েকজন একত্রে ব'সে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া কথাবার্তা বলছিলেন। গান্ধীজীকে ঘিরে ব'সে ছিলেন ডাক্তার রায়, ডাক্তার আন্সারী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা। হঠাৎ ডাক্তার রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সরোজিনী ব'লে উঠলেন: 'ডক্টর রয়! আপনার বয়স তো এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি—এই বয়সেও দেখছি আপনার গালে দিব্যি কেমন টোল খাচ্ছে!'

সুরসিক বিধানচন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনী নাইডুর সেই কৌতুকীর

জবাব দিলেন এইভাবে : 'আপনার বয়স তো পঞ্চাশের ওপর এবং একজন মহিলা আপনি—এ-বয়সেও আপনি তা লক্ষ করছেন!'

জবাব শুনে, গান্ধীজী ও উপস্থিত সবাই প্রাণখুলে আর না হেসে থাকতে পারলেন না।

খোঁচা খেলে, তার প্রত্যুত্তর কেমন রসিয়ে দিতে হয় তাও জানা ছিল বিধানচন্দ্রের। তারই একটা নমুনা দিয়েছেন সাংবাদিক সুদেব রায়চৌধুরী : "একবার বিধানসভায় সেচ-বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে বিতর্ক চলছে। সেচমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় অনুপস্থিত। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ রায়ই সেচ-বাজেটটি বিধানসভায় পেশ করেন। আলোচনার ফাঁকে একসময় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, তখন বিরোধী দলের নেতা, হঠাৎ পিছনের দিকে তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। স্পীকারকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, 'মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে সেচের মতো এত বড়ো একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে—ওই যে ট্রেজারি বেঞ্চে ব'সে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ফাইল-পত্তর দেখছেন—উনি কি জানেন, ব্যারাজ কাকে বলে, আর ড্যামই বা কি?' উপস্থিত সদস্যরা জ্যোতিবাবুর কথা শুনে ভাবলেন, ডাঃ রায় বুঝি এবার উত্তেজিত হয়ে যা-তা বলবেন। উনি সেদিকে গেলেন না। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : 'জাতিবাবু, (জ্যোতিবাবুকে জাতিবাবু ব'লে ডাকতেন তিনি) এটা তো খুব সহজ প্রশ্ন। ড্যাম ইজ ড্যাম, ব্যারেজ ইজ ব্যারেজ'!"

বলা বাহুল্য সভকক্ষে তখন হাসির রোল প'ড়ে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র যে রসিয়ে বেশ গল্প করতে পারতেন, তার একটি উদাহরণ পাই অতুল্যবাবুর স্মৃতিচারণায় : "বাঁকুড়ায় খেয়েদেয়ে

উঠলুম। ওখানে একরকম সন্দেশ পাওয়া যায়। বললেন—সবাইকে দিয়ো। যাদের বললেন তারা খুব উৎসাহ সহকারে জানিয়ে গেল—হ্যাঁ স্যার! দেওয়া হচ্ছে। পরে জানতে পারলেন ওই মিষ্টান্ন দেওয়া সম্ভব হয় নি। যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদের ডেকে বললেন—"ওহে, তোমাদের কাজ দেখে একটা গল্প মনে হচ্ছে। ছোটোভাই বড়োভাইকে লিখছে দীর্ঘ চিঠি। চিঠির মর্মার্থ হচ্ছে, দাদার আয় অল্প। বাড়িতে অসুখ-বিসুখের জন্য খুবই কষ্টে কাটিয়েছে। ছোটোভাই কিছু না পাঠাতে পারায় খুবই দুঃখিত। দীর্ঘ চিঠির শেষে ছোটোভাই লিখেছে—'তোমার অত কষ্টেও গত বছর কিছু পাঠাতে পারি নাই, এ-বছর তাহাও পারিলাম না।'—তোমরা আমাকে বললে—'আর সন্দেশ দেওয়া গেল না।'—তোমরা তো একবারও দাও নি!" ব'লেই হাসলেন। তারপরে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমাদের হাসি চাপা দায়। পরে হাসতে হাসতে বললেন—"বড়ো বড়ো লোকের কাজের বাড়িতে এ-রকমই হয়! একবারও কাটলেট দেওয়া হয় নি, কিন্তু বাড়ির কর্তা বলছেন—ওহে, আর-একবার কাটলেট দেখাও!"—ব'লেই হাসি, অফুরন্ত হাসি—অথচ, শব্দ থাকতো না।"

কথা বলতে গিয়ে, হঠাৎ যদি কখনো কারও নাম ভুল ব'লে ফেলেন, তাতেও কোনো অপ্রস্তুত-ভাব নেই। তা সে-নাম সাধারণ কারও হোক, বা প্রধানমন্ত্রীরই হোক! মজা ক'রে সেই ভুল-বলার কারণ ব্যাখ্যা ক'রে সকলকে আনন্দ দেন।

১৯৫৭ সালের কথা। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দিতে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল। বিশাল জনসভা। সভামঞ্চে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র এবং রাজ্যের নেতৃস্থানীয় আরও অনেকে। ডাঃ রায় চেয়ার ছেড়ে

উঠে দাঁড়ালেন। মাইকের সামনে গিয়ে বললেন: 'এবার আমি আমার পুরাতন বন্ধু মতিলালকে তাঁর ভাষণ দিতে অনুরোধ করছি।'

'বন্ধু জওহরলাল' না ব'লে অম্লানবদনে ব'লে গেলেন 'বন্ধু মতিলাল'!

স্বভাবতই জনসাধারণের মধ্যে এবং নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গের মধ্যে হাসির রোল প'ড়ে গেল। সে-হাসিতে স্বয়ং জওহরলালও যোগ দিলেন।

প্রায় দশলক্ষ লোকের সম্মিলিত সেই হাসির কারণ সহসা বুঝে উঠতে পারলেন না ডাঃ রায়। তিনি শুধু পাশ ফিরে একবার তাকালেন। সেই সময় একজন তাঁর কানে কানে বললেন সেই হাসির গূঢ় রহস্যের কারণ।

বিধানচন্দ্রের ঠোঁটের কোণে তখন মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি তখন অমায়িকভাবে ব'লে গেলেন: "আমার একটু ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু এজন্য আমাকে দায়ী করা ঠিক হবে না। জওহরলালকে চেনবার বহু আগে থেকেই আমি তার পিতা মতিলালকে জানি। জওহরের মধ্যে আমি আমার সেই পুরাতন বন্ধু তার পিতা মতিলালের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাই। বিশ দশকের গোড়া থেকেই আমি নেহরু-পরিবারের প্রায় একজন সদস্যেই পরিণত হয়েছি। তখন থেকেই আমি জওহরকে চিনি—মতিলালের পুত্ররূপে। তাই, বন্ধু মতিলাল নেহরুর কথাই আমার আগে মনে প'ড়ে যায়।"

জওহরলালের প্রতি ডাঃ রায়ের যে সম্পর্ক ছিল তা একাধারে স্নেহের ও পরম-বন্ধুত্বের। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল বয়সে ছোটো। তাঁকে ডাঃ রায় শুধু 'জওহর' বলেই সম্বোধন করতেন। অনুজপ্রতিম সেই বন্ধুর জন্য বিধানচন্দ্রের অন্তরে ছিল সুগভীর স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা। ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে. দমদম এয়ারপোর্টে সবাই লক্ষ করলো

দিল্লীগামী মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের সঙ্গে একগাদা ডাব চলেছে বিমানে। ডাব! কার জন্য অত ডাব? কার জন্য আবার, 'প্রিয় জওহর'-এর জন্য। দিল্লীতে সুস্বাদু কচি ডাব দুষ্প্রাপ্য। বন্ধুর জন্য ইতিমধ্যে তাই লোক মারফত এক ডজন ডাব পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না, এবারে নিজেই সঙ্গে নিয়ে চলেছেন একগাদা ডাব।

কৌতুকপ্রিয় বিধানচন্দ্র মাঝে মাঝে এমন সব মজার কাণ্ড ক'রে বসতেন যে, সঙ্গীদের তাক্ লেগে যেতো। তাঁরা মনে করতেন বিধানচন্দ্র নিজের অজ্ঞানতাবশতই অমন কাণ্ড করেছেন, কিন্তু তিনি যে জেনেশুনেই সবাইকে একটু মজা দেবার জন্য তাঁর সেই আপাত-অজ্ঞানতা প্রকাশ করেছেন, তা তাঁরা ধরতে পারতেন না।

সেবারে কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশন। ডাঃ রায় অধিবেশনের আগে একদিন কল্যাণী থেকে কলকাতায় ফিরছেন। যশোর রোড ধ'রে গাড়িতে আসছেন। সঙ্গে আছেন আরও অনেকে। কেউ তাঁর সঙ্গে, কেউ-বা অন্য গাড়িতে। রাস্তার দু'ধারে রবিশস্যের সবুজ সমারোহ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এক জমির দিকে তাকিয়ে ডাঃ রায় মন্তব্য করলেন—দেখেছ, কী চমৎকার 'ছোলা'-র চাষ হচ্ছে!! পাশে যিনি ছিলেন, তিনি সেদিকে একবার দেখে নিয়ে বললেন—'ছোলা' নয়, ওগুলো 'মশুর'। ডাঃ রায় সঙ্গী ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—রবিশস্য সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না দেখছি; নাও, গাড়ি থামাও। গাড়ি থামলে তাঁরা নামলেন, রাস্তার পাশের নয়ানজুলি পেরিয়ে সোজা চ'লে গেলেন শস্যক্ষেতে। সেখানে এক বৃদ্ধ চাষী মাঠের কাজ করছিল। তাকে ডাঃ রায় বললেন—বাঃ, বেশ 'ছোলা'-র ফলন হয়েছে তো এবার! সে-কথা শুনে অবাক হয়ে বৃদ্ধ চাষী বললে—এগুলান 'ছোলা' নয় কত্তা, এ

হলেন 'মশুর'। এবারে ডাঃ রায়ের অপ্রস্তুত হবার পালা। কিন্তু বিন্দুমাত্র সেভাবটি ফুটে উঠলো না তাঁর চোখেমুখে। উল্টে সেই বৃদ্ধ চাষীকেই তিনি বললেন—কী চাষ করছ, তা তুমি নিজেই জানো না দেখছি! ব'লেই সহযাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন। সহযাত্রীটি তখন আর সেই ব্যাপার নিয়ে বিধানচন্দ্রকে কোনো কথা বলতে সাহস করেন নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে ডাঃ রায়ের মুখের দিকে তাকালে তিনি লক্ষ্য করতেন, সেই মুখে তখন বিরাজ করছে মন্দমধুর কৌতুকময় হাসির একটি রেখা।

প্রাণের সজীবতা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও ছিল অক্ষুণ্ণ।

৩০-এ জুন সন্ধ্যাবেলায়, অসুস্থ বিধানচন্দ্রকে দেখতে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল সরোজিনী-কন্যা পদ্মজা নাইডু। ডাঃ রায় তাঁর ৩৬-নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রীটের (এখনকার নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটের) বাড়িতে শায়িত। স্নেহের পাত্রী পদ্মজা এসেছেন শুনে, ডাঃ রায় চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকালেন।

পদ্মজা তাঁর বিছানার পাশে, একটি চেয়ারে ব'সে, বিধানচন্দ্রের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তারপর একসময় তিনি ডাঃ রায়কে উদ্দেশ ক'রে বললেন: "আগামীকাল আপনার জন্মদিন। কাল কিন্তু আপনার কারও সঙ্গে দেখা করা চলবে না।"

অসুস্থ মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের ঠোঁটের কোণে একটু যেন মৃদুহাসি ঝিকিয়ে উঠলো। রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ব'লে উঠলেন: "কেন এই নিষেধাজ্ঞা?"

পদ্মজা বললেন: "আপনার বর্তমান স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে, তাই এই ব্যবস্থা।"

ডাঃ রায় তখন সকৌতুক ভঙ্গিতে হেসে বললেন: "স্বাস্থ্যের কথা বলছ? কিন্তু স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা তো ডাক্তার হিসেবে

আমিই ভালো বুঝি !”

পদ্মজা বুঝলেন, এভাবে ডাঃ রায়ের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। তিনি তাই অন্য পথ ধরলেন। তাঁর পাশেই, অন্য একটি চেয়ারে ব'সে ছিলেন সুবিমলচন্দ্র রায়, বিখ্যাত আইনজীবী, তথা ডাঃ রায়ের ভাইপো। তাঁর দিকে তাকিয়ে রাজ্যপাল পদ্মজা ব'লে উঠলেন : “মিঃ রায়, আপনি তো একজন বিখ্যাত আইনজীবী। বলুন তো, এক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র কী বলে ? মুখ্যমন্ত্রী কি রাজ্যপালের আদেশ অমান্য করতে পারেন ?”

আইনজীবী মিঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন : “নিশ্চয়ই নয় ! এ-ব্যাপারে শাসনতন্ত্রের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার।”

অসুস্থ, এবং যিনি আর ঘণ্টাকয়েক বাদেই তাঁর জন্মদিনকে মৃত্যুদিনে পরিণত করে চিরতরে বিদায় নেবেন এই পৃথিবী থেকে, সেই সুরসিক বিধানচন্দ্র স্মিতহাস্যে পদ্মজা নাইডুর দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন : “ঠিক আছে ! রাজ্যপালের আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরেই পালন করবো।”

হ্যাঁ সে-কথাও তিনি অক্ষরে অক্ষরেই পালন করেছিলেন।

‘জন্মদিনের সাক্ষাৎ’ আর হ'লো না কারও সঙ্গে।

ফুলের মালা ও ফুলের স্তবক নিয়ে যাঁরা তাঁকে পরদিন সকালে অভিনন্দিত করতে এসেছিলেন, তাঁরা সেই পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক রেখে গেলেন তাঁর নিষ্প্রাণ মরদেহে।